দাম : দশ টাকা

# স্বস্তিকা

৬৬ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা।। ২৬ মে - ২০১৪।। ১১ জ্যৈষ্ঠ - ১৪২১।। website : www.eswastika.com

# সূচীপত্র


সম্পাদকীয় ▯ ৫

মোদী বিস্ফোরণের আকূল দরিয়া ▯ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ৬

মোদী-বিরোধী — ভারতবিরোধী?▯ ▯ দেবাশিস আইয়ার ▯ ৯

খোলা চিঠি : গান্ধী পরিবার না থাকলে আমরা কার সেবা করব?▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

নবারুণের নবোদয় ▯ অম্লানকুসুম ঘোষ ▯ ১২

রিগিং দক্ষতার ফলপ্রকাশে রাজ্যে গেরুয়া ঝড়ে ফুঁসছে মানুষ ▯ সাধন কুমার পাল ▯ ১৪

সদ্য সমাপ্ত লোকসভা ভোটের ফলাফলের নিরিখে রাজ্যের ২১টি বিধানসভা কেন্দ্রে এগিয়ে বিজেপি▯ ১৫

পশ্চিমবঙ্গের ফলাফল ▯ ১৬

ভারতে ধর্মান্তরকরণ ▯ অধ্যাপক কৃষ্ণকান্ত সরকার ▯ ২০

দশাবতার ও ভারতের জাতীয় জীবন : কূর্মাবতার ▯ ড: ইন্দ্রজিৎ সরকার ▯ ২১

রামকৃষ্ণ জননী চন্দ্রমণি দেবী ▯ রূপশ্রী দত্ত ▯ ২৩

অভিযোগপত্র আর নয় ▯ তভলীন সিং ▯ ২৭

হিন্দুত্বই সাম্প্রদায়িকতা বিনাশকারী এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার মহৌষধ ▯ ড: গোপেশ চন্দ্র সরকার ▯ ২৯

এবারের নির্বাচনে ধর্ম ও রাজনীতি মেশেনি ▯ ৩১

জাগো ভারত লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ মোদীর সরকার ▯ অমলেশ মিশ্র ▯ ৩৩


প্রচ্ছদ নিবন্ধ

পৃঃ ১৪ - ১৭


নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ ▯ ▯ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ ▯ ▯ অঙ্গনা : ২৬ ▯

অন্যরকম : ৩৪ ▯ ▯ পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৫ ▯ ▯ সমাবেশ-সমাচার : ৩৬ - ৩৮

▯ ▯ রঙ্গম : ৩৯ ▯ ▯ শব্দরূপ : ৪০ ▯ ▯ চিত্রকথা : ৪১ ▯ ▯ প্রাসঙ্গিকী : ৪২



**সম্পাদক : বিজয় আঢ্য**

**সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য**

**প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত**

৬৬ বর্ষ ৩৭ সংখ্যা, ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৬, ২৬ মে - ২০১৪

**দাম : ১০ টাকা**

**বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।**

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।



দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬

৮৬৯৭৫২১৪৭৯

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪,

৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২



**Postal Registration No.-**
Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57



দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

প্রকাশিত হবে ২রা জুন ২০১৪

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ২রা জুন ২০১৪

## আগামী সংখ্যার বিশেষ বিষয়

### ভারতীয় সংবিধানে হিন্দুত্ব

নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছিলেন জন্মসূত্রে তিনি হিন্দু ও দেশকে ভালোবাসেন। সেই সূত্রে তিনি হিন্দু জাতীয়তাবাদী। প্রধানমন্ত্রী হলে এক্ষেত্রে সংবিধানই হবে তাঁর পথ-প্রদর্শক। এদিকে লক্ষ্য রেখেই এবারের বিষয়— ভারতীয় সংবিধানে হিন্দুত্ব উপাদান— লিখেছেন উপানন্দ ব্রহ্মচারী। সেইসঙ্গে থাকছে ভারতীয় উপমহাদেশের সাংস্কৃতিক উদ্বাস্তু সমাজ। লিখেছেন— অধ্যাপিকা গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রকাশিত হবে ৯ই জুন ২০১৪

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ৯ই জুন ২০১৪

## প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

### বিশেষ সংখ্যা (সম্পূর্ণ রঙিন)

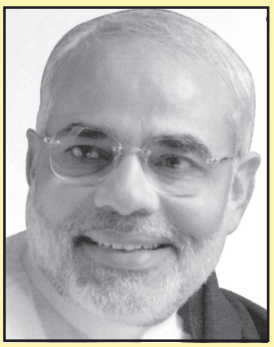

শ্রী নরেন্দ্র মোদীর ঐতিহাসিক বিজয়ে ভারতবর্ষে হিন্দু জাতীয়তার নবজাগরণের সূচনা হলো, যা বিশ্বে ভারতবর্ষকে প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। দেশের এই শুভ মুহূর্তটিকে ধরে রাখার জন্য প্রকাশিত হচ্ছে 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী' সংখ্যা। তথ্য ও বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ এই সংখ্যাটি অবশ্যই সংরক্ষণযোগ্য।

।। দাম ১৫.০০ টাকা মাত্র।।

# সম্পাদকীয়

## ভারতের জয়

রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, শ্যামাপ্রাসাদ প্রমুখ মনীষী যে সমৃদ্ধ বৈভবশালী ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহাকে নস্যাৎ করিতে জিন্না অনুগামীবৃন্দ, জামাতে ইসলামী সমর্থকবৃন্দ অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। অনেক বৎসর অনেক অপপ্রচার করিয়াও অসফল হইয়াছে মেকি-ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোসধারীরা। মোদী চাহিয়াছিলেন—'ইন্ডিয়া ফার্স্ট'— ভারতই প্রথম। নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশের পরই মোদী ট্যুইট করিয়া জানাইয়াছিলেন—এই জয় ভারতের জয়। তাহাই হইয়াছে। জয় হইয়াছে ভারতের এবং ভারতবাসীরও। দেশকে যাঁহারা পরম বৈভবশালী রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে এতদিন স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্বপ্ন সার্থক হইয়াছে। দেশের ঐতিহ্য সংস্কৃতি পরম্পরাকে মেকি-ধর্মনিরপেক্ষতার শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিবার কৌশল এইবার আলগা হইবে কিনা তাহা ভবিষ্যতের বিষয়, কিন্তু দেশের জাতীয়তাবোধ এবং মর্যাদা যে এখনও নির্মূল করা যায় নাই, এই নির্বাচনে তাহা আবার প্রমাণিত হইয়াছে। দেশে জাতীয়তাবাদের জয় হইয়াছে। শরিক নির্ভরতা নয়, এই প্রথম কোনও জাতীয়তাবাদী দলের একক সরকার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে দেশে। যাহার মূল লক্ষ্য হইতেছে উন্নয়ন ও বিকাশ। গত প্রজাতন্ত্র দিবসে দেশের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন, 'খণ্ড জনাদেশ অনেকসময় এক জনপ্রিয় নৈরাজ্য তৈয়ারি করিয়া থাকে। দেশের প্রয়োজন স্থায়িত্ব।' সেই স্থায়িত্বের প্রয়োজনেই এই জনাদেশ। সোনিয়া গান্ধীর 'মওত কী সওদাগর' অপপ্রচার জনগণ এমন বাতিল করিয়া দিয়াছে যে সোনিয়া রাহুলের কংগ্রেস এখন আঁস্তাকুড়ের আবর্জনায়। বিরোধী দলের মর্যাদাটুকুও এই দলকে জনগণ দিতে রাজি হয় নাই। নরেন্দ্র মোদীকে যে যে স্থানে এবং যে যে নেতারা কুৎসা করিয়াছিলেন জনগণ কুলোর বাতাস দিয়া তাঁহাদের বিদায় করিয়াছে। মনমোহন মন্ত্রিসভার প্রায় সব মন্ত্রীই পরাজিত হইয়াছেন। সলমন খুরসিদের মতো কয়েকজনের জামানত পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। নীতিশ কুমারের দল নিশ্চিহ্ন হইয়াছে বিহারে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মোদী সম্পর্কে যত নিকৃষ্ট বাক্য ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহার প্রতিদান পাইয়াছেন। লোকসভা নির্বাচনে এই রাজ্যের ৪২টি আসনের মধ্যে ৩৪টি আসন পাইয়াও তিনি ঢোঁড়া সাপ হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিজের বিধানসভা কেন্দ্রের মানুষ তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। এই কেন্দ্রের মানুষের হৃদয়ের সম্রাট নরেন্দ্র মোদী। এই লজ্জা ঢাকিতেই তিনি নিশ্চুপ হইয়া গিয়াছেন। মোদী প্রধানমন্ত্রী হইলে যে দেশ রসাতলে যাইবে না তাহা ভারতবর্ষের জনগণ অতঃপর উপলব্ধি করিয়াছেন। তিনি সমগ্র দেশের উন্নয়ন করিতে বদ্ধপরিকর, আজ তাঁহার বাক্যেও প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। তাঁহার মতে, কোনও রাজ্য শক্তিশালী, কোনও রাজ্য দুর্বল হইলে দেশকে শক্তিশালী বলা চলে না।' অন্য সকলে এত কুৎসা করিবার পরেও মোদীই একমাত্র বলিতে পারেন, 'গণতন্ত্রে কেহ কাহারও শত্রু নয়, সকলেই প্রতিদ্বন্দ্বী, আর ভোট হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতাও শেষ হইয়া যায়।' সকলের সহিত আলোচনা করিয়া সকলকে সঙ্গে লইয়াই এইবার সরকার গঠন হইতেছে। নূতন সরকারের হাতে কোনও যাদুদণ্ড নাই যে পূর্বের দশবছরের সমস্ত অপকীর্তি দূর করা যাইবে, রাতারাতি মূল্যবৃদ্ধি দূর হইবে। মোদী পূর্বেই বলিয়াছেন, আমাদের সমাজে দুর্নীতি থাকিবে, কাজে ফাঁকি দিবার লোক থাকিবে, কাজ পণ্ড করিবার লোকেরও অভাব হইবে না। তবুও সদিচ্ছা থাকিলে এই সিস্টেমের মধ্যেও কাজ করা সম্ভব। রাতারাতি সবকিছু দূরীভূত না হইলেও এক উন্নত ভারতের সন্ধানে যাত্রা শুরু হইয়াছে। তাঁহার সাফল্য ইতিমধ্যেই দেখা যাইতেছে অর্থনীতির ক্ষেত্রে। ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে নরেন্দ্র মোদীর নাম ঘোষণা হইলে এই পর্যন্ত ১ লক্ষ কোটি টাকার বিদেশি লগ্নি শেয়ারবাজারে প্রবেশ করিয়াছে। একমাত্র স্থায়ী সরকারের আশাতেই বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতের শেয়ার বাজারের উপর বাজি ধরিয়াছে। বৈদেশিক লেনদেন ঘাটতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জাতীয় উৎপাদনের ২ শতাংশে নামিয়া আসিতে পারে। মোদীর উপর দেশের মানুষের প্রত্যাশা অনেক। মোদীর পক্ষে ইহাই চ্যালেঞ্জ। মোদীর প্রধামন্ত্রিত্বে সরকার সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করিতে সফল হইবে—ইহাই বিশ্বাস।

## সুভাষিত

*কলিঃ শয়ানো ভবতি, সংজিহানস্তু দ্বাপরঃ।*
*উত্তিষ্ঠন্ত্রেতা ভবতি, কৃতং সম্পদ্যতে চরন্।*
*চরৈবেতি চরৈবেতি।।*

*কলি যুগের লক্ষণ হলো যে, সকলেই শুয়ে থাকে (অর্থাৎ অলস ভাবে জীবন যাপন করে), দ্বাপরে অর্ধ জাগরণ অবস্থা (অর্থাৎ জেগে শুয়ে থাকে), ত্রেতায় মানুষ উঠে দাঁড়ায় এবং সত্যযুগে মানুষ চলতে শুরু করে। অতএব! এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।*

# মোদী বিস্ফোরণের অকূল দরিয়া

**সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ।।** পৃথিবীতে বড় বড় যুদ্ধের ইতিহাস নাড়াচাড়া করলে বিশেষত আধুনিক যুদ্ধ ও মারণাস্ত্র প্রয়োগের প্রতিক্রিয়া ও কুফলগুলি নিয়ে সারা বিশ্বেই আলোচনা হয়। আমাদের ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ও মোদীর প্রধানমন্ত্রিত্বে আরোহণ পর্বের মধ্যে প্রকটিত সেগুলি আলোচনায় আনা যেতে পারে।

(১) গান্ধী মালিকানাধীন কংগ্রেস দল যে নামতে নামতে কখন ৪৪ আসনের একটি নিছক আঞ্চলিক দলের সমগোত্রীয় সংখ্যায় নেমে এসেছে তা শুধু অভাবনীয়ই নয় যে কোনো আত্মমর্যাদাবিশিষ্ট দলীয় প্রধানের পত্রপাঠ পদত্যাগ করা প্রায় বাধ্যতামূলক করে তোলে। কেননা বড়, মাঝারি ও ছোট মিলিয়ে দশ দশটি রাজ্যে তাদের কোনো আসন নেই। পরিবারের মালকিন বিরাজমান থাকলেও ১৭৮ জন সন্তানের জামানত বলি হয়েছে। ধন্য মোদী এফেক্ট!

(২) এই জয়যাত্রা আক্ষরিক অর্থেই কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারীর পরিধিতে প্রাপ্ত। মোদীর সমর্থকদের সাগরের জলে ডুবে মরার প্রবল আক্রোশজড়িত ভাষণ দেওয়া ফারুক আবদুল্লা তাঁর ছেলে-পুলেদের নিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন। প্রসঙ্গত তাঁর জামাই শচীন পাইলটও আসন খুইয়েছেন। মনে রাখতে হবে ঘোর হিন্দু-বিদ্বেষী সেকুলারি মুখোশপরা এই ফারুক মোদী সরকার হলে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার মতো হিম্মত দেখিয়েছিলেন। এই নির্বাচনী ফলাফল (জম্মু ও কাশ্মীর পিডিপি-র সঙ্গে ৬টির মধ্যে বিজেপি ৩টি আসন জিতেছে।) তাঁকে বিপুল চাপের মুখে ফেলল।

(৩) দিল্লীতে মাতৃগর্ভ থেকে নির্গত হয়েই ক্রমাগত গালি- গালাজের মাধ্যমে সটান ভারতের প্রধানমন্ত্রীর তখত দখলের স্বপ্নে মশগুল আম আদামি দল ৪৪২টি আসনে প্রার্থী দিয়ে ৪২০ টিতে জামানত (যোগেন্দ্র যাদব, কুমার বিশ্বাস-সহ) খুইয়েছে।

(৪) অসমের বোড়োদের জমি কেড়ে নেওয়া বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের ভোটে বারবার জিতে আসা তরুণ গগৈ তাঁর চাল ধরা পড়ে যাওয়ায় ভোট গণনা শেষ হওয়ার আগেই ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন। অসমে তাঁর সরকার এখন সংখ্যালঘু (আক্ষরিক নয়) বিজেপি ৭টি আসন পেয়েছে।

(৫) মোদী জয়-জনিত বিস্ফোরণের তীব্রতায় ১৪টির মধ্যে বংশবাদী দলগুলি প্রায় মুছে যাওয়ার মুখে। কংগ্রেসের মিলিন্দ দেওরা, জিতিন্দ্রপ্রসাদ, প্রিয়া দত্ত, চিদাম্বরমপুত্র কার্তি, লালুর মেয়ে, বউ, মুলায়মের (পরিবারের ৫ জন ছাড়া) দলের সকলে তলিয়ে গেছে। রেকর্ড সৃষ্টি করে ১৫ জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরাজিত হয়েছেন। ২৮ জনের মধ্যে হারের ভয়ে ১০ জন ভোটেই লড়েননি। তার মধ্যে ঘোর সাম্প্রদায়িক মুসলমান নেতা সলমন খুরশিদ (প্রতিবন্ধীদের টাকা হজম করে ফেলেছেন) ও মিথ্যাচারী কপিল সিবাল গো-হারান হেরেছেন। উত্তরপ্রদেশ-সহ অসংখ্য কেন্দ্রে সর্বকালীন রেকর্ড সংখ্যায় কংগ্রেসীদের জামানত জব্দ হয়েছে।

(৬) বিহারে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখা নীতিশ মোদীর আদ্যশ্রাদ্ধ করার ফল হাতেনাতে পেয়ে ইস্তফা দিয়েছেন। তাঁর গুরুগম্ভীর সভাপতি শরদবাবুও পরাজিত। তিনি নাকি আগামী বিধানসভায় মোদীর জয় চরম জ্ঞাতি শত্রু কয়েদী লালুর সঙ্গে পুনঃ জোটবদ্ধ হতে চান।

(৭) দেশব্যাপী ইস্তফার পাহাড়ে মোদীর জয়ের জৌলুসই না ঢাকা পড়ে যায় এমন একটা অবস্থায় আমাদের পলিটব্যুরোর রাজ্যের দিকে এবার নজর ফেরাতে হবে। মনে পড়বে ভোট ঘোষণার পরে পরেই সেই মান্ধাতা আমলের তাঁবাদি ধান্দার রাস্তায় হেঁটে প্রকাশ কারাট কি এক ১১টি ছাঁট দল নিয়ে জড়ো হয়েছিলেন। যাদের আদ্দেকই ফোকটসে প্রধানমন্ত্রী হতে চান। মার্ক্সবাদী প্রকাশ দেশের মঙ্গলে বিজেপি-কে ঠেকাতে এসব করছেন। এই কপট দেশহিতৈষীর দলকে দেশবাসী ৯টির বেশি আসন দেননি। মোদীর এই পরাক্রমে তাঁদের সর্বভারতীয় দলের তকমা হয়তো মুছে যাবে। এর চেয়েও ভয়াবহ কাণ্ডও ঘটতে চলেছে। রাজ্যে তৃণমূলের ডাণ্ডায় তিনি বাড়ি ছেড়ে এতদিন নগণ্য বিরোধী হয়ে সদর দরজায় ছিলেন। হিসেবে দেখা যাচ্ছে বিজেপি-র ১৮ শতাংশ ভোট পাওয়ার পর ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সাম্প্রদায়িকতার বিপদ প্রভৃতি ভোট কুড়োনোর দল ধরা পড়ায় তাঁদের আর দেওয়ার কিছু নেই। মানুষ ক্রমাগত তাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আগামী বিধানসভায় তাঁরা বিজেপি-র কাছে বিরোধী দলের তকমা খোয়ানোর ভয়ে কম্পমান, সন্ত্রস্ত, বিমানবাবু সাংবাদিকদের ভর্ৎসনা করে সাংবাদিক সম্মেলন ছেড়ে পালিয়েছেন বলে খবর।

(৮) শেষ চমকপ্রদ প্রতিক্রিয়াটি (তবে ইস্তফা দেওয়ার কোনো খবর নেই।) আলোচনা করে শেষ করব। ফলাফলে দেখা গেল পরাজয়ে সকলেই হতাশ, আর সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের রাজ্যে দিদিভাই জালিয়াতি-টালিয়াতি করে ৩৪টি আসন পেয়েও উল্লসিত নন। তিনি ভবিষ্যতের দিগন্ত রেখা দেখতে পাচ্ছেন। কয়েক মাস পরে কলকাতা পুরসভার ১৪১টি আসনে নির্বাচন। বিশদ পর্যালোচনায় তিনি দেখেছেন ২৩ টিতে বিজেপি এগিয়ে, ৪৭ টিতে দ্বিতীয় অর্থাৎ মোট আদ্দেক। তাঁর নিজের কেন্দ্রে এমনকি ৭৩নং ওয়ার্ডে তাঁর বাড়িতেও তিনি হেরে বসে আছেন। কলকাতা উত্তর দক্ষিণে বিজেপি দ্বিতীয় স্থানে। কলকাতাকে চার ভাগে ভাগ করে ইতিমধ্যে বিজেপি কর্মীরা কাজে নেমে পড়েছেন। তিনি যুগপৎ শঙ্কিত ম্রিয়মান। দড়ি-টড়ি কেনার কথা আর হয়তো ভাবছেন না। পরাজিতদের সঙ্গে একাসনে বসে বিজয়ীকে এমন বিষাদগ্রস্ত কেউ কখনও দেখেছেন? তবে হ্যাঁ, লোকসভায় মোট আসনের ১০ ভাগ না জেতায় পারিবারিক দলটি বিরোধী দলের মর্যাদা হারানোর মওকায় দিদি ও আম্মা নাকি জড়াজড়ি করে যুগ্ম বিরোধী (৩৪+৩৭=৭১ পাওয়ায়) হয়ে গদি (ডেপুটি স্পিকার, বিরোধী দলনেতা) পাওয়ার মতলব আঁটছেন। অঘটনের বিচিত্রতায়, সর্বোপরি সৃষ্টির সম্ভাবনাময় ভারতের ইতিহাসে এ এক সর্বাংশে অবিস্মরণীয় নির্বাচন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

# নতুন সরকার জনতার আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারবে : ভাইয়াজী যোশী

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ ভাইয়াজী যোশী গত ১৯ মে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন— দেশের কোটি কোটি জনতা পরিবর্তনের আশায় এবার লোকসভা ভোটে ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভোট দিয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস নতুন সরকার দেশের জনগণের ভাবনা ও আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে সমর্থ হবে। তিনি আরো আশা ব্যক্ত করেছেন— আমাদের সকলের সহযোগিতায় বৈচারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ভেদাভাবের ওপরে উঠে বিষমতাপূর্ণ ব্যবহার থেকে মুক্ত হয়ে শোষণমুক্ত ও একাত্মসমাজ নির্মাণের দিকে এই সরকার এগিয়ে যেতে সফল হবে। তিনি বলেন— গণতন্ত্রে সরকারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে যে, পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার একটি নিজস্ব গতি থাকে এবং এই পরিবর্তন সরকার, প্রশাসন, সমস্ত রাজনৈতিক দল, জনগণ, সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্থার সম্মিলিত চেষ্টার দ্বারাই সম্ভব হয়। শ্রী যোশী নবনির্বাচিত সরকার ও দেশবাসীকে এই পরিবর্তনের জন্য শুভকামনা জানিয়েছেন।

# নেপালে হিন্দুরাষ্ট্রের দাবিতে আন্দোলন

**সংবাদদাতা॥** গত ৭ মে নেপালের ধনগড়িতে হিন্দুরাষ্ট্রের দাবিতে জোরদার আন্দোলন শুরু হয়। জাতীয় প্রজাতন্ত্র পার্টির এই আন্দোলনে খুব বেশি সংখ্যায় জনসাধারণ অংশগ্রহণ করে। পার্টির সভাপতি কমল থাপা জনসাধারণ উদ্দেশে বলেন, নেপালে ৮০ শতাংশ হিন্দু থাকা সত্ত্বেও মাওবাদী সরকার সেকুলার দেশ ঘোষণা করেছিল। এটা নেপালের হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবনার প্রতি আঘাত করা ছাড়া কিছুই নয়। তিনি নেপালের জনসাধারণের প্রতি আবেদন করেন, নেপালকে আবার হিন্দুরাষ্ট্র ঘোষণার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে সংঘর্ষ করতে হবে। শ্রী থাপা অভিযোগ করেন, স্থানে স্থানে হিন্দু রাজাদের মূর্তি ভেঙে ফেলা হচ্ছে। অন্য বক্তারা বলেন, জাতীয় প্রজাতন্ত্র পার্টি হিন্দুরাষ্ট্র বাঁচাও ও গোরক্ষা অভিযান চালাচ্ছে। হিন্দুরাষ্ট্র ঘোষণা করা না হলে এই আন্দোলন চলতেই থাকবে। উল্লেখনীয় যে, যখন থেকে নেপালকে সেকুলার রাষ্ট্র ঘোষণা করা হয়েছে তখন থেকে নেপালে এই আন্দোলন চলছে। নেপালের হিন্দুদের এক বৃহদংশ মনে করে, বিশ্বের মধ্যে নেপালই একমাত্র হিন্দুরাষ্ট্র ছিল কিন্তু আন্তর্জাতিক চক্রান্তে সেকুলার ঘোষণা করা হয়েছে। এই চক্রান্তে খৃস্টান ও মুসলমান শক্তি যুক্ত আছে।

# ভাঙ্গড়ে সঙ্ঘের কার্যকর্তার গায়ে হাত তৃণমূল নেতার

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিরোধীদের শেষ করার অভিযানে নেমেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার ভাঙ্গড় অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। এবারের লক্ষ্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। আর এস এসের সোনারপুর মহকুমার (সরকারি মহকুমা না হলেও কাজের সুবিধার জন্য সঙ্ঘ সোনারপুরকে মহকুমা হিসাবে গণ্য করে) কার্যবাহ অর্থাৎ সম্পাদক তপন পালের বাড়ি ভাঙ্গড়ে। ভাঙ্গড় থানার ঠিক সামনেই তপনবাবুর প্রায় ৫০ বছরের পুরোনো তিন পুরুষের চায়ের দোকান। গত লোকসভা ভোটের প্রচারে এসে বিজেপি-র কর্মী সমর্থকেরা বিভিন্ন কারণে প্রায়ই এসেছে তপনবাবুর দোকানে। সেই অপরাধে ১৭ মে বেলা ১২টা নাগাদ ভাঙ্গড় থানার লাগোয়া এক তৃণমূল কার্যালয়ে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয় তপনবাবুকে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের ভাঙ্গড় জয়ের অন্যতম নায়ক কাইজার মহম্মদ। তপনবাবু আর এস এস-এর সদস্য সেকথা স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে সজোরে থাপ্পড় মারেন কাইজার। সেইসঙ্গে তার সাগরেদ কোদালের বাঁট, লাঠি ইত্যাদি নিয়ে তপনবাবুর উপর চড়াও হয়। তারপর তাঁকে তাঁর দোকান উঠিয়ে দেওয়া হবে বলে শাসানো হয়। বাঁচার একমাত্র উপায় হলো তাঁকে মুচলেখা দিতে হবে যে সে কোনোরকম সংগঠন করবে না। সেই মুচলেকা ১৮ মে সকাল ১০টার মধ্যে ওই তৃণমূল কার্যালয়ে জমা দিতে বলা হয়।

আর এস এস-এর রাজ্য ও জেলার বেশ কয়েকজন প্রতিনিধি ১৯ মে সকালে ঘটনাস্থলে যান। সঙ্গে ছিলেন বিজেপি-র দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা নেতৃত্ব। তপন পাল এই ঘটনার আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ভাঙ্গড় থানায় এফ আই আর করেছেন, কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত পুলিশ কোনো কেস নম্বর দিতে পারেনি। গত লোকসভা নির্বাচনে ভাঙ্গড় এলাকায় কাইজার বাহিনীর দৌরাত্ম্য বারবার উঠে এসেছে খবরের শিরোনামে, তাই এই ভয়ঙ্কর ফতোয়ায় এলাকায় নতুন করে সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি হচ্ছে।

# প্রতি বছর পাকিস্তান থেকে আসছে ৫ হাজার হিন্দু

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** পাকিস্তান হিন্দু পরিষদ (পি এইচ সি)-এর সদস্য রমেশকুমার বাংকবওয়ানী গত ১৩ মে পাকিস্তানের সংসদে দাবি করেছেন যে প্রতি বছর ৫ হাজার হিন্দু ধর্মীয় অত্যাচারের কারণে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে ভারতে চলে যাচ্ছে।

পাকিস্তানি সংবাদপত্র 'ডন' পি এইচ সি-র সদস্য শ্রী বাংকওয়ানীর সংসদে দেওয়া বিবৃতির প্রেক্ষিতে লিখেছে যে, সিন্ধুপ্রদেশে গত দু'মাসে শুধুমাত্র ধর্মীয় কারণে হামলার ৬টি মামলা দায়ের হয়েছে। এতে হিন্দুদের কোরান পোড়ানোর মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। শ্রীবাংকওয়ানী দাবি করেছেন, পাকিস্তানে ধর্মীয় কারণে হিন্দুদের ওপর খুবই অত্যাচার চালানো হচ্ছে। শ্রী বাংকওয়ানী সিন্ধু প্রদেশের অন্দরুণী এলাকায় হিন্দু মেয়েদের জোর-জবরদস্তি মুসলমান বানানোর বিরুদ্ধে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য পাকিস্তান সরকারের কাছে আবেদন জানান। পাকিস্তানে সংসদবিষয়ক রাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ আফতাব আশ্বাস প্রদান করেন যে, পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার জন্য সমস্তরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

# মালদায় গঙ্গার ধারে হিন্দুদের মৃতদেহ দাহ করতে বাধা দিচ্ছে মুসলমান দুষ্কৃতীরা

**তরুণ কুমার পণ্ডিত : মালদা॥** মুর্শিদাবাদ জেলায় হিন্দুরা সংখ্যালঘু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ঘটনায় মুসলমান দুষ্কৃতীদের অত্যাচার ক্রমশ বেড়ে চলেছে। মৃতদেহ সৎকার করতে গিয়ে হিন্দুরা তাদের মৃতদেহ পোড়াতে না পেরে ফিরে আসতে বাধ্য হচ্ছে। সম্প্রতি এমনই এক ঘটনা ঘটেছে মুর্শিদাবাদ জেলার অর্জুনপুর ও নয়নসুখ অঞ্চলের অর্জুনপুর গ্রামে। গত ৪ মে হাজারপুর গ্রামের ধীরেন পাল মারা গেলে তাঁর শবদেহ সৎকার করতে প্রথমে মুসলমানরা বাধা দেয়। তারপর বোম মারে। শবযাত্রীরা ভয়ে পালিয়ে গেলে মুসলমান দুষ্কৃতীরা মৃতদের গঙ্গায় ভাসিয়ে দেয়। পরে গ্রামের মানুষ অর্জুনপুরে শ্মশানে গিয়ে শবদেহ দেখতে না পেয়ে থানায় বিক্ষোভ দেখায় এবং ৭-৮ জনের নামে এফ আই আর দায়ের করে। পুলিশ এখনও পর্যন্ত দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করতে পারেনি। থানায় বসে সর্বদলীয় বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে এরপর মৃতদেহ সৎকার করতে গেলে থানায় জানাতে হবে। আবার ৫ মে অর্জুনপুরের আর এক ব্যক্তি মারা যায়। তখন পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে শবদাহ করতে গেলে মুসলমান অধ্যুষিত এই শ্মশান ঘাটে শবদাহ করতে বাধা দেওয়া হয়। কয়েকশো মুসলমান জমায়েত হয়ে প্রথমে বচসা ও পরে পুলিশের উপর ইঁট পাটকেল ছুঁড়তে শুরু করে। পুলিশবাহিনী পিছু হটে, মৃতদেহ রাত্রি ১১টা পর্যন্ত গ্রামীণ হাসপাতালের মাঠে পড়ে থাকে। এরপর পুলিশ মৃতদেহ উঠিয়ে গাড়িতে করে ফরাক্কা ব্যারেজের ধারে দাহ করে। প্রশ্ন উঠেছে, সরকারি রেলের জায়গাতে মুসলমানরা বাড়ি তৈরি করে বসবাস করতে পারলে হিন্দুরা গঙ্গার তীরে ২০০ বছরের পুরানো শ্মশানঘাটে শবদাহ করতে পারবে না কেন? এই ঘটনায় হিন্দু গ্রামগুলিতে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। মুসলমান দুষ্কৃতীরা অর্জুনপুর বাজারে গুণধর ঘোষের ৪-৫টি দোকান ভাঙচুর করেছে। তারা বলছে 'আমরা এই ঘাটে মড়া পোড়াতে দেব না।' প্রশাসন এফ আই আর-এ নাম থাকা ভদু শেখ, রফিকুল শেখ ও হদিল শেখ-সহ বেশ কিছু দুষ্কৃতীকে এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার করেনি। ৭ মে আবার একজনের মৃত্যু হলে অর্জুনপুর গ্রামের মানুষ অন্যত্র দূরে নিয়ে গিয়ে শবদাহ করে। এস ডি ও-এর কাছে সর্বদলীয় বৈঠকে দীর্ঘদিন ধরে মুসলমান অধ্যুষিত এই গ্রামে হিন্দুরা মৃতদেহ সৎকার করতে না পারার ঘটনা ও শবদেহ লোপাট করার ঘটনা নিয়ে প্রতিবাদ করে আসছে। বিজেপি ছাড়া অন্য রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব তাদের শ্মশানে শবদেহ সৎকার করার পক্ষে মত দেয়নি। সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের কাছে হার স্বীকার করে প্রশাসন সিদ্ধান্ত নিয়েছে মৃতদেহ গঙ্গার ধারে নয়, ফরাক্কার ফিডার ক্যানেলের ধারে দাহ করতে হবে। হিন্দুস্থানে হিন্দুদের শেষ সময়েও পবিত্র গঙ্গাতে তাদের দেহ সৎকার করতে পারবে না, এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের আর কী হতে পারে?

# মোদী বিরোধী — ভারতবিরোধী ?

## (4 BAD 'M' বনাম 1 GOOD 'M')

**দেবাশিষ আইয়ার**

হাজার বিরোধিতা সত্ত্বেও মোদী রথ আটকানো গেল না। মোদী সুনামি (যার এখন নতুন নাম—সুনমো)-তে ভেসে গেল মোল্লা মুলায়ম, ইটালিপন্থী কংগ্রেস, চীনপন্থী বাম গ্রুপ এবং অন্যান্যরা যারা উন্নয়নের বদলে জাত-ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে দেশটাকে উচ্ছন্নে নিয়ে যাবার প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। ২০১৪ পরবর্তী ভারতে শুরু হল মোদী যুগ—হিন্দুত্বের যুগ—উন্নয়নের যুগ। ভারতের জনগণ বুঝিয়ে দিল তারা হিন্দুত্ব আর উন্নয়নে কোনও বিরোধ দেখে না। আর তাই হিন্দুত্ববাদী বিজেপি-কে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে লোকসভায় পাঠাল ভারতবাসী।

সম্প্রতি IBN-7-এ বিনোদ দুয়া-কে একটি সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে আদবানীজি বিপক্ষ শক্তিকে বারবার শত্রু বলেছিলেন, তাতে বিনোদ দুয়ার গোঁসা হয়েছিল—আদবানীজির মত বড় নেতা বিপক্ষকে শত্রু বলেন কি করে! আর এখান থেকেই আমাদের ভেবে দেখতে হবে ভারতের বিপক্ষ দলগুলির চরিত্র। এরা কি রাজনৈতিক মতাদর্শগত ভাবে বিরোধী না দেশ বিরোধী। মতাদর্শগত বিরোধীদের গণতন্ত্রে উপযুক্ত সম্মান আছে, কিন্তু দেশ বিরোধীদের? ২০১৪-র নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে দেখে নেওয়া যাক না এই বিরোধীদের আসল রূপটি।

গত ২৫ এপ্রিল পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর লোকসভা কেন্দ্রে প্রচারে গিয়ে নরেন্দ্র মোদী কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন মোদীকে আটকানোর জন্য কংগ্রেস সর্বশক্তি লাগিয়ে দিয়েছে, এমনকী বিভিন্ন বেসরকারি NGO-র সঙ্গেও হাত মিলিয়েছে। অধিকাংশ মিডিয়া খবরটা এড়িয়ে গেলেও দৈনিক বর্তমান ২৬ এপ্রিল সংখ্যায় গুরুত্ব সহকারে খবরটা ছেপেছে। এখন প্রশ্ন হলো—অধিকাংশ মিডিয়া এটিকে এড়িয়ে গেল কেন? তাহলে অধিকাংশ মিডিয়ার কি কিছু উদ্দেশ্য প্রণোদিত স্বার্থ আছে?

কয়েকদিন আগে বিহারের বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং বলেন, যারা অন্ধভাবে মোদীর বিরোধিতা করছে তাঁরা আসলে 'পাকিস্তান-পরস্ত' অর্থাৎ পাকিস্তানপ্রেমী। কথাটা কি খুব ভুল? ইতিহাসের পটে সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডগুলোকে একটু বিচার করে খোঁজাই যাক না উপরের প্রশ্নগুলোর উত্তর।

মোদী বিরোধিতার সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত—

১. মুম্বই সেন্ট জেভিয়ার্সের প্রিন্সপাল ফাদার মাসকা রান্স্ কলেজের ওয়েবসাইটে তাঁর ছাত্রদের ভোট দেবার আবেদন করার অছিলায় মোদীকে দাঙ্গার মুখ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পথে অন্তরায় এবং গুজরাট মডেলের মিথ্যা প্রচারকারী হিসাবে তুলে ধরে তাঁকে ভোট না দেবার আবেদন জানান এবং তার কিছুদিন আগেই কলেজে কংগ্রেস প্রার্থী মিলিন্দ দেওড়াকে আহ্বান জানান ভোট প্রচারের জন্য। এর থেকে স্পষ্ট হয় সেন্ট জেভিয়ার্স কমিউনিটির সঙ্গে কংগ্রেসি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। যদিও এটাই স্বাভাবিক, কারণ ইতালিই তো খৃস্টান মিশনারীদের হেড কোয়ার্টার।

২. সম্প্রতি সাহিত্যিক ইউ. আর. অনন্তমূর্তি বলেন, মোদী প্রধানমন্ত্রী হলে তিনি দেশ ছেড়ে চলে যেতে চান।

৩. গুলজার, শাবানা আজমি, মহেশ ভাট প্রমুখের উদ্যোগে PROGRESSIVE WRITERS ASSOCIATION -এর তরফে বারাণসীতে ঘরে ঘরে প্রচার করা হয়েছে মোদীর প্রধানমন্ত্রী হওয়া দেশের পক্ষে কত বিপজ্জনক।

৪. শবনম হাসমি (বামপন্থী নাট্যকার সফদর হাসমির মেয়ে)-র নেতৃত্বে JAWAB নামের একটা গ্রুপ যাতে ৫০টা NGO যুক্ত তারা দেশ জড়ে ২০০০ ভলেন্টিয়ারকে ১০০টা লোকসভা কেন্দ্রে পাঠিয়েছে মোদীর বিরুদ্ধে প্রচারের জন্য।

৫. এই সমস্ত মোদী-বিরোধী শক্তির FOREIGN COUNTERPART-রা USA, UK প্রভৃতি দেশে বিভিন্ন গ্রুপের সাথে মিশে সেখানকার সরকারে ANTI-MODI LOBBY করার প্রয়াস চালিয়েছে। সেখানকার বিভিন্ন কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ANTI-MODI CAMPAIGN করেছে।

৬. সলমন রুশদি, অনীশ কাপুরের মতো ২৫ জন NRI ইংল্যান্ডের বিখ্যাত GUARDIAN পত্রিকায় মোদীর বিরুদ্ধে কুৎসামূলক রচনা লিখে সবাই একজোট হয়ে মোদীজীকে ঠেকানোর জন্য আহ্বান করেছেন।

৭. একইভাবে চেতন ভাট, গৌতম আপ্পা-র নেতৃত্বে ৭৫ জন LSE, OXFORD, CAMBRIDGE-এর বামপন্থী শিক্ষাবিদ লন্ডনের INDEPENDENT NEWS PAPER-এ প্রবন্ধ লিখে সবাইকে একযোগে মোদীবিরোধী অভিযানে সামিল হতে বলেছেন।

৮. পশ্চিমবঙ্গেও 'এই সময়' পত্রিকায় অশোক বিশ্বনাথন, বিভাস চক্রবর্তীদের নেতৃত্বে একদল তথাকথিত বুদ্ধিজীবী মোদীকে কেন সকলের আটকানো উচিত সে নিয়ে গালভরা প্রবন্ধ লেখেন।

তাদের সবাই মোদী বিরোধিতায় যে ধুয়োটি তোলে তা হলো, মোদী সাম্প্রদায়িক, দাঙ্গাবাজ এবং মোদীর গুজরাট মডেল নাকি ভুয়ো। কিন্তু এরাই মুসলিম লিগের সঙ্গে হাত মেলাতে আপত্তি করে না বা SIMI-র প্রাক্তন সম্পাদককে রাজ্যসভার সদস্য বানাতেও দ্বিধা করে না। এদের এই দু'মুখো নীতি মিডিয়ার যুগে সমাজে সামনে চলে আসছে বলে PUBLIC LIFE-এ এরা সম্মান ও বিশ্বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে। মোদী-বিরোধী এই সমস্ত গ্রুপগুলোর সম্পর্ক কিরকম একটু দেখে নেওয়া যাক। দেখে নেওয়া যাক কোন কোন NGO কংগ্রেসিদের সঙ্গে হাত মেলানোর জন্য

মোদীজীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। আর কেনই বা গিরিরাজজী ভুল কিছু বলেন নি।

প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দুর্বল করবার জন্য পরিকল্পিতভাবে ইংরেজরা একটি নরমপন্থী গ্রুপকে প্রোমোট করে। এরা তিলক-নেতাজি-অরিবন্দ-র পূর্ণ স্বরাজের ভাবনার বদলে ইংরেজ অধীনে স্বায়ত্ত-শাসনের ভাবনাকে প্রাধান্য দিত। সোজা কথায় বলা যেতে পারে, এরা ছিল ইংরেজদের দালাল। এরাই পরবর্তী ক্ষেত্রে পল্লবিত হয়ে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে হিন্দু তথা ভারতীয় জাতীয়তা বিরোধী মতবাদকে মদত দিতে শুরু করে। পিছিয়ে পড়ে স্বামীজী- নেতাজী-তিলক- সাভারকরের হিন্দু জাতীয়তাবাদের ভাবনা। এদেরকে পরিকল্পিত ভাবে ফান্ডিং করে MUSLIM-MISSIONARIES-MARXIST GROUP। ১৯৬৬ সালের পরে এদের সঙ্গে যুক্ত হয় MAOIST GROUP। এদের মূল কাজ হলো ভারতে নৈরাজ্যবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদকে মদত দেওয়া। কখনো RELIGIOUS HARMONY-র বেশে, কখনো HUMAN RIGHTS-র বেশে অথবা কখনো PROGRESSIVENESS PROMOTE করার অছিলায়। অর্থাৎ এবারের লোকসভায় লড়াই হল **4 BAD 'M' (MUSLIM-MISSIONARIES-MARXIST-MAOIST GROUP)** বনাম **1 GOOD 'M' (MODI)**।

বর্তমান ভারতে এরকম কিছু গ্রুপ হল—

১. IAMC (INDIAN AMERICAN MUSLIM COUNCIL)

২. PROXSA (PROGRESSIVE SOUTH ASIANS)

৩. FOIL (FEDERATION OF INQUALABI LEFTIST)

৪. AID (ASSOCIATION FOR INDIS'S DEVELOPMENT)

৫. CAIR (COUNCIL OF AMERICAN ISLAMIC RELIGION)

৬. AICC (ALL INDIA CHRISTIAN COUNCIL)

৭. AIMA (ASSOCIATION OF INDIAN MUSLIM OF AMERICA)

এবং এদের কিছু SISTER CONCERN হলো—ASDSA, ASAP, CSDI, FOSA, ASHA FOR EDUCATION প্রভৃতি।

এই সমস্ত সংগঠনগুলির সঙ্গে যুক্ত ভারতের কিছু বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব হল —

১.**সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সামাজিক ক্ষেত্র**---অরুন্ধতী রায়, বিজয় প্রসাদ, বিনয়লাল, বিনায়ক সেন, বিজু ম্যাথিউ, বর্ষ মান্দার, হর্ষ ডোভাল, তিস্তা শীতলবাদ, মেধা পাটেকর, অরুণা রায়, যোগেন্দ্র যাদব, গোপাল রায়।

২. **ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে**—সুগত বসু ও তাঁর স্ত্রী আয়েশা জালাল (যিনি সাদাত হোসেন মান্টোর নাতনি), রোমিলা থাপার, ইরফান হাবিব, বিপান চন্দ্র। এঁরা সাব অল্টার্ন স্টাডিজের নামে জাতিভেদকে উসকে দেওয়ার জন্য দায়ী ঐতিহাসিকেরা।

৩. **ধর্মীয় ক্ষেত্রে**—বিজু ম্যাথিউ, জন দয়াল, জন প্রভুদাস, ফাদার সেড্রিক প্রকাশ।

৪. **মিডিয়া ক্ষেত্রে**—NDTV, HINDU, HINDUSTAN TIMES, INDIA TODAY GROUP সম্পূর্ণরূপে এবং TIMES OF INDIA, NETWORK 18 GROUP আংশিক রূপে এবং তুলনায় অনেক বেশি সৎ ZEE GROUP, INDIA TV, ABP GROUP.

ভারতীয় গোয়েন্দা রিপোর্টে উঠে এসেছে কীভাবে ওই সমস্ত NGO গুলো ভারতে নৈরাজ্য বজায় রাখার জন্য অর্থ যুগিয়ে গেছে। যেমন—

১. তালিবান-আল-কায়দা-ISI-র তরফে ফান্ডিং করা হয় JKLM, IM, SIMI-কে।

২. চীনের তরফে ফান্ডিং করা হয় CPI-ML, AISA, PWG, MCC দের।

৩. বিভিন্ন মিশনারি গ্রুপের তরফে ফান্ডিং করা হয় ভারতে সেবার আড়ালে ধর্মান্তকরণকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য।

অরুণ শৌরি তাঁর বিখ্যাত দুটি গ্রন্থ---MISSIONARIES ও EMINENT HISTORIANS-এ এই সমস্ত ভারত বিদ্বেষী গ্রুপের ব্যাপারে বিস্তারে জানিয়েছেন। তেমনি সম্প্রতি সুব্রহ্মনিয়াম স্বামী ও রাজীব মালহোত্রার তরফে বেশ কিছু গবেষণাপত্র ও বই বেরিয়েছে (যেমন---BREAKING INDIA)। যেখানে তাঁরা দেখিয়েছেন কিভাবে ভারতবিদ্বেষী বিভিন্ন গ্রুপ নিজেদের ধান্দায় ভারতে হিন্দু বিরোধিতা এবং সেই কারণে মোদী-বিরোধিতায় মদত জোগাচ্ছে। আর তাতে বুঝে বা না বুঝে ভারতের কিছু কচিকাঁচা তরতাজা যুবক-যুবতী সামিল হচ্ছে। এরকমই একটি MOVEMENT ছিল আমআদমি পার্টির আন্দোলন। ভারতকে দুর্নীতি মুক্ত করার অছিলায় এরা আসলে ভারতে মোদীকে ঘিরে যে জাতীয়তাবাদী আবেগ উঠেছে সেটিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার কাজে লেগেছিল। যার জন্য তাদের কাছে ফান্ডিং এসেছিল FORD FOUNDATION প্রভৃতি ভারত বিদ্বেষী শক্তিগুলোর থেকে। কিন্তু মিডিয়া ও সোশাল মিডিয়ার দৌলতে তাদের এই আসল চেহারা সামনে এসে যাওয়ায় এ যাত্রায় বাঁচোয়া।

কিন্তু এরা সতত ক্রিয়াশীল। বিভিন্ন রূপ ধরে বিভিন্ন সময় আত্মপ্রকাশ করে। এদের ভয় মোদী এলে, ভারতে হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিস্তার হলে ধর্মান্তরণ বন্ধ হবে। ফলে ফান্ড আসা বন্ধ হবে। সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের আড়ালে নিজেদের স্বেচ্ছাচারিতার মৌরুসি পাট্টা চলবে না। ফলে ধীরে ধীরে তাদের রমরমাও কমবে। বাড়তে থাকবে রামকৃষ্ণ মিশন, আর্য সমাজ ও অন্যান্য হিন্দু প্রতিষ্ঠানের রমরমা। শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ইতিহাস লিখন ক্ষেত্রেও এদের একাধিপত্য খর্ব হবে।

তাই মরার আগে শেষ কামড় দেবার জন্য এবারের নির্বাচনের প্রাক্কালে সবাই অতি সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। তার ওপর সম্প্রতি গুজরাটি চ্যানেল 'সন্দেশ'-এ মোদী একটি সাক্ষাৎকারে যখন জানিয়েছেন আমেরিকা যেভাবে গুপ্ত প্ল্যান করে লাদেনকে মেরেছিলো আমিও তেমনিভাবে দাউদ এবং অন্যান্য ভারত বিদ্বেষীদের খতম করব। ব্যস, সবাই নড়েচড়ে বসেছিল। বুঝে গেছিল তাদের শেষের সময় শুরু।

আর তাই সবাই একজোট হয়ে নেমে পড়েছিল মোদী আটকাও অভিযানে। কিন্তু মোদী-বিরোধিতার সুর যে সমস্ত দল তুলেছিল জনগণ তাদের আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে তারা এদের থেকে অনেক বেশি বিশ্বাস করে মোদী অ্যান্ড কোম্পানিকে।

# গান্ধী পরিবার না থাকলে আমরা কার সেবা করব ?

প্রিয় পাঠক,

১৫ আগস্ট, ১৯৪৭। ইউনিয়ন জ্যাক নেমে উঠল ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা। কিন্তু ভারত স্বাধীন হলো না। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটল। বারবার যেভাবে কখনও মোগল, কখনও পাঠানদের হাতে পরাধীনতার শৃঙ্খল পরতে হয়েছে ভারত মাকে, সেটাই আবার ঘটল ১৯৪৭-এর সেইদিন। এতদিন ছিল বিদেশি শক্তির পরাধীনতা এবার এল বিদেশি শক্তি পরিচালিত দেশি মুখোশের হাতে পরাধীনতা। ঠিক যেদিন সেই স্বাধীনতা নামের সূর্য উঠেছিল তার আগের দিনই তিন টুকরো হয়েছে ভারত মা। রক্তাক্ত জননীকে আরও বেশি করে প্রতিদিন রক্তাক্ত করার কাজ পূর্ণ করতে গান্ধী পরিবার নামক এক শক্তির কাছে পরাভূত হলো ভারত।

প্রধানমন্ত্রী হলেন জওহরলাল নেহরু। আর তারপর ভারত দেশটাই হয়ে গেল তাঁর পরিবারের সম্পত্তি। মেয়ে ইন্দিরা, নাতি রাজীব কিংবা নাতবউ সোনিয়ার মাধ্যমে একের পর এক দশক ভারত শাসন করতে লাগল গান্ধী পরিবার। এ যেন গণতন্ত্রের নামে এক রাজতন্ত্র। কিন্তু এবার ছেদ পড়ল। নেহরু-গান্ধী পরিবারের হাত থেকে মুক্তি পেল ভারত। ১৬ মে, ২০১৪। প্রকৃত স্বাধীনতা পেল ভারত।

এতটুকু পরে পাঠক নিশ্চয়ই ভাবছেন কেন অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে আগেও তো সরকার পরিচালিত হয়েছে। তারও আগে মোরারজি দেশাইকেও তো ভুললে হবে না। তবে এইবারের জয়কে কেন হঠাৎ প্রকৃত স্বাধীনতা বলা হবে।

না পাঠক বন্ধু, মোরারজি দেশাই, বাজপেয়ী কিংবা অন্যান্যদের নেতৃত্বে সরকার গঠনের মধ্যে স্বাধীনতার এই স্বাদ ছিল না। সেই সময় গান্ধী পরিবারের সদস্যদের বিরোধী বেঞ্চে বসতে হলেও আসলে সরকারের মধ্যেও মিশে ছিল ওই পরিবারের বশংবদ এজেন্ট দলেরা। যারা চার প্রজন্ম ধরে ওই পরিবারের দাসত্ব করে চলেছে। না, নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এই স্বাধীনতার পরও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি গান্ধী পরিবারের দাসদাসীরা। তবে এবার তাদের নখ, দাঁত নেই। এবার আর সরকারের কাজে গান্ধী পরিবারের চাপ চাপিয়ে দেওয়ার এজেন্টরা নেই সরকারের মধ্যে কিংবা সরকারের সমর্থনে। এই প্রথম দেশে একটি স্বাধীন সরকারকে ক্ষমতায় এনেছে দেশবাসী। বৃটিশ যেমন দেশ শাসনের জন্য 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' চালু করেছিল, বৃটিশ বন্ধু নেহরু-গান্ধী পরিবারও সেই পদ্ধতিতেই দেশ পরিচালনা করেছে এতকাল। আবার গান্ধী পরিবারের বশংবদরাও সেই ডিভাইড অ্যান্ড রুলকেই চালিয়ে গেছে বছরের পর বছর। এক ভারতের মধ্যে তৈরি করেছে অনেক ভারত। অনেক ছোট ছোট ভারত। এটা জাঠের ভারত, এটা হিন্দুর ভারত, এটা মুসলমানের, এটা দলিতের, এটা রাজপুতের, এটা... । না পাতার পর পাতা লিখে সেই ছোট ছোট ভারতের হিসেব দেওয়া মুশকিল। এবার সেই ভাগ ভাঙার ভাল দিন এল ভারতে। তাই তো এটা প্রকৃত স্বাধীনতা। ভোটব্যাঙ্কের নোংরামি মুক্ত ভারতের সূচনা। দলিত প্রেমী বহেনজি শূন্য। মুসলমান প্রেমী মোল্লা মুলায়মজির হাতে রইল ৫। দেশের সর্ববৃহৎ রাজ্য উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসের ভাগ্যে মাত্র দুটি আসন। সে দুটিই গান্ধী পরিবারের। মা ও বেটার জয়ও আবার মোল্লা মুলায়মের অঞ্জলি। আর এটাই প্রমাণ করে আসলে যতই বিরোধিতা থাকুক নিজেকে যাদবদেরও নেতা বলে দাবি করা মুলায়মজি আসলে গান্ধী পরিবারেরই বশংবদ দাসানুদাস।

হ্যাঁ পাঠক, এই প্রথম দেশে এমন একটি সরকার ক্ষমতায় যার গায়ে কোনও সম্প্রদায়ের তকমা নেই। দেশের এমন কোনও সম্প্রদায় নেই যার সমর্থন নেই এই সরকারে। এখনও গান্ধী পরিবারের এজেন্টদের যেটুকু বিভেদ রাজনীতির জোর আছে তার জেরে কিছু কমবেশি সমর্থন আছে, কিন্তু এই সরকার সত্যি সত্যিই ভারতের সরকার। এই সরকার সবার সরকার। এই সরকার আপামর দেশবাসীর সরকার। এই সরকার স্বাধীন সরকার।

বৃটিশ চলে যাওয়ার পরও যেমন বৃটিশের প্রভাব চলে যায়নি তেমনই গান্ধী পরিবার দুর্বল ও পরাস্ত হওয়ার পরও বশংবদদের দাস-চরিত্রে ভাটা পড়েনি। খুব তাড়াতাড়ি পড়বেও না। এখনও শোনা যাবে, সোনিয়া মায়ের প্রতি কান্না মিশ্রিত আব্দার, রাহুল ফেল করেছে ঠিক আছে এবার নয় প্রিয়াঙ্কাকে আসরে নামান। গান্ধী পরিবার না থাকলে আমরা কার সেবা করব ?

আর সেই কান্নায় এই রাজ্যের দাদা-দিদিরাও কম যান না। সেকথা নয় পরের চিঠিতে বলব।

ভাল থাকুন। স্বাধীনতা উপভোগ করুন।

— **সুন্দর মৌলিক**

# নবারুণের নবোদয়

**অম্লানকুসুম ঘোষ**

ঘনতমসাবৃত ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ দুর্যোগময় দীর্ঘ রাত্রির অবসানের পর পবিত্র ঊষালগ্নে যখন পুবাকাশ আলো করে সূর্যোদয় হয় তখন সমগ্র জীবজগৎ যেমন আনন্দ ও স্বস্তির সঙ্গে এক নতুন আলোকোজ্জ্বল স্নিগ্ধ দিবসের আগমনকে প্রত্যক্ষ করে সেরকমই বর্তমানে এক যুগসন্ধিক্ষণে ভারতের আপামর জনসাধারণ প্রত্যক্ষ করছেন দুর্নীতিকণ্টকিত, অন্তর্কলহে জর্জরিত, নীতিপঙ্গুত্বে আবদ্ধ এক সরকারের দশবর্ষব্যাপী শাসনকালের অবসান। দোলাচলচিত্ততায় দোদুল্যমান বাধ্যতামূলক জোট রাজনীতির ত্রিশবর্ষব্যাপী যুগের অবসান। তথাকথিত আন্তর্জাতিকতায় মায়ায় বিপথগামী ছয় দশকের দীর্ঘ সময়ের অবসানের পর, আজ স্বাধীনতার ৬৭ বছর পরে দেশের শাসনক্ষমতা এককভাবে দখল করেছে জাতীয়তাবাদী, সৎ, দূরদর্শী রাজনৈতিক দল বিজেপি।

আজ বড় আনন্দের দিন, গত এক শতকে জাতির জীবনে এরকম সর্বব্যাপী আনন্দের দিন এসেছিল মাত্র দুবার। এক, ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে। দুই, ১৯৭৭ সালে জরুরি অবস্থা জারি করা ইন্দিরা গান্ধী সরকারের পতনের দিন। কিন্তু গত দু'বারই জাতির জীবনের সেই আনন্দঘন মুহূর্ত ম্লান হয়ে গিয়েছিল, তাৎক্ষণিক স্বস্তি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পরে দেশের শাসনক্ষমতায় এক শক্তিশালী একদলীয় সরকার ছিল ঠিকই, কিন্তু সেই সরকারের প্রধান নীতিনিয়ন্তা নেহরুর আত্মঘাতী একের পর এক সিদ্ধান্ত দেশের উন্নতিকে ত্বরান্বিত করেনি বরং দেশকে করে তুলেছিল শত্রুদেশের মৃগয়াক্ষেত্র। আবার ১৯৭৭ সালে জরুরি অবস্থার অবসানে দেশে যে সরকার গঠিত হয় তা জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় উন্নতিকামী ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হলেও তাতে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের অভাব ছিল। ফলে অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্যের জেরে সেই সরকারও দেশকে বেশিদিন সঠিক পথের দিশা দেখাতে পারেনি। দেশ আবার পড়েছিল পরিবারতন্ত্রের খপ্পরে। দু'দুবার স্বর্ণালী স্বপ্নের এহেন অপমৃত্যুর পর স্বভাবতই অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে এবারও এই নবপ্রভাতের অঙ্কুরেই বিনাশ ঘটবে না তো? এই প্রশ্নের উত্তর হলো 'না'। কারণ গত দু'বারের স্বপ্নভঙ্গের যে দুটি কারণ ছিল সে দুটি এবারে অনুপস্থিত। প্রথমত, এবারে দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রক শক্তি বিজেপি এবং তার প্রধান নীতিনিয়ন্তা নরেন্দ্র মোদী জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক ও সময়োপযোগী সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে উন্নয়নের পথ প্রস্তুতকারক, দ্বিতীয়ত, বিজেপিতে গণতান্ত্রিক পরিকাঠামো এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে থাকলেও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ এখানে যথেষ্ট। ফলে এই ঐক্যবদ্ধ দেশপ্রেমিক শক্তি দেশের এই নবপ্রভাতকে রৌদ্রকরোজ্জ্বল দ্বিপ্রহরে উপনীত করবে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই আশা রাখা যায়।

বিজেপি-র আজকের এই জয়ের প্রকৃতি ও পূর্ব পটভূমিকা একটু পর্যালোচনা করা যাক। ইউপিএ সরকারের দুর্নীতি ও নানা অপদার্থতা তাদের বিদায় একপ্রকার নিশ্চিত করে রেখেছিল, তৎকালীন প্রধান বিরোধী দল বিজেপি স্বাভাবিকভাবেই একমাত্র বিকল্প হিসেবে জনসাধারণের কাছে ছিল। কিন্তু গণতান্ত্রিক কাঠামোবিশিষ্ট বিজেপি-র নানা মতান্তরকে সংবাদমাধ্যম আপন কল্পনার মিশেলে বিজেপি-র অন্তর্কলহ বলে জনসাধারণের সামনে উপস্থাপিত করে। কিন্তু গত এক বছরে বিজেপি-র কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বিজেপি-র ঐক্যের ছবি জনসাধারণের গোচরে করে তোলে এবং একের পর এক বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয়ে বিজেপি পৌঁছে যায় লোকসভা নির্বাচনের দোরগোড়ায়। বিভিন্ন পূর্বাভাস জ্ঞাপনকারী সংস্থার মতানুযায়ী তখন এনডিএ সরকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সময়ের অপেক্ষা ছিল, কিন্তু তা কতটা শক্তিশালীভাবে হবে তা নিয়েই ছিল জল্পনা। জল্পনায় সময় অপব্যয় না করে প্রকৃত, জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিরা নির্বাচনে ঝাঁপিয়ে পড়েন অক্লান্তভাবে। নির্বাচন সমাপ্ত হয়, বুথফেরত সমীক্ষা জানায় নিরঙ্কুশভাবে বিশাল ব্যবধানে ক্ষমতায় আসতে চলেছে এনডিএ। অবশেষে আসে ফল ঘোষণার দিন। সব প্রত্যাশী, সব সমীক্ষার ফলাফল, সব ভবিষ্যদ্বাণীকে ছাপিয়ে গিয়ে বিজেপি-র সাফল্য আকাশচুম্বি। গোটা দেশে ৫৪৩টি আসনের মধ্যে বিজেপি একাই পেয়েছে ২৮৩টি আসন। সব মিলিয়ে এনডিএ পেয়েছে ৩৩৭টি আসন। কোনও অকংগ্রেসী দলের পক্ষে যা সর্বকালীন সর্বোচ্চ আসন, আর গত তিরিশ বছরে ভারতের যে কোনও দলের পক্ষে সর্বোচ্চ আসন। অপরদিকে পরিবারতান্ত্রিক কংগ্রেস ৪৬টি আসন ও ইউপিএ পেয়েছে ৫৮টি আসন। কোনও আসন না জিতে লোকসভায় প্রবেশের অধিকার হারিয়েছে বিএসপি, ডিএমকে। রাজ্যওয়ারী বিশ্লেষণে আসা যাক। ভারতের সর্ববৃহৎ রাজ্য উত্তরপ্রদেশে ৮০টির মধ্যে ৭৩টি পেয়েছে বিজেপি। উত্তরপ্রদেশে কোনও দলের পক্ষে সর্বকালে এটিই সর্বোচ্চ আসন। বিভিন্ন সমীক্ষা ও বিজেপি-র নিজস্ব হিসেবেও উত্তরপ্রদেশ থেকে ৫০টির মতো আসন লক্ষ্য হিসেবে রাখা হয়েছিল। কিন্তু মানুষের তীব্র ভালবাসা আর সমর্থন সব অঙ্কের হিসেবকে নস্যাৎ করে দিয়ে বিজেপিকে দিল আশাতীত সাফল্য। পর্যায়ক্রমে মুলায়ম ও মায়াবতীর কুশাসনে অতিষ্ঠ উত্তরপ্রদেশবাসী এবার মুক্তির আশায় বিজেপি'রই শরণাপন্ন। দিল্লী, উত্তরাখণ্ড, হিমালচলপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট, গোয়া প্রভৃতি বর্তমানে বা নিকট অতীতে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে সবকটি আসন-ই জিতেছে বিজেপি। মধ্যপ্রদেশে ২৯টির মধ্যে ২৭টি ও ছত্তিশগড়ে ১১টির মধ্যে ৯টি আসন পেয়েছে বিজেপি। অর্থাৎ বিজেপি'র সুশাসন যে সমস্ত প্রদেশের মানুষজন একবার পেয়েছে তারা কেন্দ্রেও এবার নিরঙ্কুশভাবে বিজেপিকেই চেয়েছে। দীর্ঘদিনের কংগ্রেস শাসিত মহারাষ্ট্রবাসীও এবার বিজেপিকেই তাদের মুক্তিদূত হিসেবে চিনে নিয়ে ৪৮টির মধ্যে ৪৪টি আসন দিয়েছে (২৫টি বিজেপি

১৯টি শিবসেনা)। পশ্চিমবঙ্গেও বিজেপি নতুন দিশা দেখিয়েছে। তৃণমূলী অপশাসনে বিরক্ত মানুষ বিকল্প চেয়েছিল, অতীত বিভীষিকা, বামফ্রন্টের কাছে না গিয়ে তারাও তাই মোদীরই পক্ষপাতী। বিজেপির ভোট শতাংশ একলাফে তিনগুণ বেড়েছে, আসন সংখ্যাও দ্বিগুণ। এছাড়াও বহু আসনে বিজেপি দ্বিতীয় স্থানাধিকারী। রিগিংয়ের জেরে তৃণমূল আসন বেশি জিতলেও মানুষের মন থেকে তারা মুছে গেছে। যার প্রমাণ ২০১৬'র বিধানসভা নির্বাচনে পাওয়া যাবে। অসমেও বিজেপি'র ঐতিহাসিক সাফল্য। অনুপ্রবেশ সমস্যায় জর্জরিত অসমে বিজেপি রূপে ১১টির। মধ্যে ৮টি আসন জিতে বিজেপি টলিয়ে দিয়েছে সেখানকার মুখ্যমন্ত্রীর আসন। খনিজ সমৃদ্ধ ঝাড়খণ্ডে সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও উন্নয়ন কিছুই হয়নি এতদিন, এবারে উন্নয়নের ঋত্বিক নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানে তারাও বিমুখ হয়নি। ১২টি আসন জিতিয়েছে বিজেপি'কে। সংবাদমাধ্যমের বানানো গল্প বিজেপি শুধুই উত্তরের দল কিন্তু এবার দক্ষিণ ভারতেও বিজেপি'র অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটেছে বিজয়গর্বে। সদ্য হস্তচ্যুত কর্ণাটকে ২৮টির মধ্যে ১৭টি আসন জিতে তারা সেখানে আবার সর্ববৃহৎ। তামিলনাড়ুতে আসন সংখ্যার নিরিখে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল। কেরল অন্ধ্র তেলেঙ্গানায় আসন না পেলেও ভোটের শতাংশে ঘটেছে বৃদ্ধি। ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থ সিদ্ধ করতে গিয়ে ভোটের আগে অন্ধ্রপ্রদেশ ভাগ করে কংগ্রেস স্বখাতসলিলে। অন্ধ্র ও তেলেঙ্গানা উভয় জায়গাতেই তারা রিক্তহস্ত। বিহারে নীতিশ কুমার জোট ভাঙার খেসারত দিলেন নির্মমভাবে, মাত্র দুটি আসন জিতে। বিজেপি সেখানে ৪০টির মধ্যে ২২ টিতে জয়ী। উত্তরপূর্বের ছোট ছোট রাজ্যগুলিতেও পা রেখেছে বিজেপি, অরুণাচলপ্রদেশ ও মেঘালয়ে তারা জিতেছে একটি করে আসন। সন্ত্রাসকীর্ণ কাশ্মীর এবার বিজেপি'র ভরসায় বুক বেঁধেছে। সেখানেও দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হয়েছে বিজেপি। হরিয়ানা ও পাঞ্জাবেও কংগ্রেসকে চূর্ণ করেছে বিজেপি'র রথ। তবে পাঞ্জাবে আপ কিছুটা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আছে।

বিজেপি'র এই অভূতপূর্ব সাফল্যের নানা কারণ আছে। কিন্তু মূল কারণ অবশ্যই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। এবার স্বয়ংসেবকরা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচনের কাজে বিজেপিকে সাহায্য করেছে, যার ফলে বিজেপি-র বাগান আজ সাফল্য-কমলে শোভিত হয়েছে (স্মরণীয় ১৯৭৭ সালেও স্বয়ংসেবকদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতাতেই জনতা দল পেয়েছিল আশাতীত সাফল্য)।

জোট রাজনীতির অচলায়তন থেকে দেশকে মুক্ত করতে জোট করার মুন্সিয়ানাকেই কাজে লাগিয়েছে বিজেপি। বিভিন্ন ক্ষুদ্র দলকে নিজ পক্ষপুটে আশ্রয় দিলেও কেন্দ্রীয় স্তরে নিজের শক্তিকে নিয়ে গেছে অলক্ষ্যণীয় উচ্চতায়। ফলে বর্তমান লেখকের পূর্ব প্রতিবেদন অনুযায়ী এখন বিজেপি নিজ স্বাভাবিক উদারতায় জোট শরিকদের মর্যাদা দিলেও তাদের অন্যায় দাবির কাছে মাথা নোয়াবে না অর্থাৎ পরগাছা লতানের আকর্ষিতে মহীরূহের বৃদ্ধি ব্যাহত হবে না।

সমষ্টির সাফল্যের পিছনে ব্যক্তির কিছু অবদান থাকে, এক্ষেত্রে বিজেপি-র সাফল্যের পেছনে অবদান নরেন্দ্র মোদীর। ব্যক্তি হিসেবে মোদীকে একটু বিশ্লেষণ করা যাক। সাধারণত রাজনীতি জগতের সফল ব্যক্তিদের দু'ভাগে ভাগ করা যায়। একদল যাঁরা উদ্ভাবনী ক্ষমতার অধিকারী, নব নব পরিকল্পনার দ্বারা যাঁরা দেশের অর্থনীতি ও অন্য নানা ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটান, আর একদল আছেন যাঁরা হন দৃঢ়চেতা। এঁরা নানান দুর্নীতিকে দমন করেন কঠোর হাতে, দেশের সীমান্ত রক্ষা করেন নিখুঁতভাবে, সন্ত্রাসবাদী দমন করেন অসাধারণ দক্ষতায়। অর্থাৎ এক ধরনের ব্যক্তিদের বলা যায় বিকাশপুরুষ আর এক ধরনের ব্যক্তিদের লৌহপুরুষ। দেশের উন্নতিতে উভয়েরই প্রয়োজন আছে। নরেন্দ্র মোদী একাধারে দুই-ই। গুজরাটে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর এই দুই রূপের পরিচয়ই আমরা পেয়েছি। তিনি স্বাধীনচেতা কিন্তু স্বেচ্ছাচারী নন।

আশা করা যায় দেশের উন্নতিসাধনই যে সংগঠনের একমাত্র কাজ সেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অনুমতি ও আশীর্বাদ নিয়েই তিনি সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। প্রধানমন্ত্রীর কাজ যেহেতু দেশের সব ক'টি দিক স্পর্শ করে তাই প্রধানমন্ত্রী এই সবকটি গুণের সমাহারে গঠিত হওয়ায় দেশের চরম উন্নতি হওয়াই স্বাভাবিক।

বর্তমান ভারতের মনে আজ আনন্দ, দু'চোখে আজ অনেক আশা। এই চরম আশা নিয়ে সে আজ তাকিয়ে আছে উদীয়মান এক শক্তির দিকে। তাকিয়ে আছে সেই দশমবর্ষীয় বালকটি, লেখাপড়ার বদলে দু'মুঠো অন্নের জন্য যাকে কাজ করতে হয় আস্তাকুঁড়ে। তাকিয়ে আছে সেই উদ্বাস্তু শরণার্থী যাকে বাংলাদেশ বা পাকিস্তান বা কাশ্মীরের কোনও জায়গায় নিজের বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ হয়ে শরণার্থী শিবিরে দিনাতিপাত করতে হচ্ছে শুধুমাত্র ধর্মের কারণে। তাকিয়ে আছে সেই বেকার যুবক কর্মসংস্থানের অভাবে যে এতদিন নিজেকে বাবা-মার বোঝা বলে মনে করত। তাকিয়ে আছে সেই ভূমিহারা কৃষক, অনুপ্রবেশকারীদের দাপটে যে অদক্ষ শ্রমিকের কাজটুকুও পায় না। তাকিয়ে আছে উচ্চ কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত সেই শিল্পপতি, রপ্তানীযোগ্য পণ্য নির্মাণ ও রপ্তানি করে দেশের অর্থনীতির স্বাস্থ্য ফেরানো যার মূল লক্ষ্য। তাকিয়ে আছে সেই নিহত ফৌজির মা-বাবা, যাদের ছেলের মাথা কেটেছিল পাকিস্তানি ফৌজ। তাকিয়ে আছেন সেই প্রাজ্ঞ গবেষক, আপন গবেষণার দ্বারা অধিত রত্নরাজি দ্বারা যিনি দেশকে সমৃদ্ধ করতে চান, কিন্তু পান না উপযুক্ত পরিকাঠামো। তাকিয়ে আছে দেশের সর্বস্তরের সকল মানুষ। দীর্ঘ প্রতীক্ষাকালের অবসান ঘটেছে আজ তাঁদের সকলের আশাই পূর্ণ হবে।

জনপ্রিয়তার মাপকাঠি থেকে বলা যায়, গান্ধীজী, নেতাজী ও শ্যামাপ্রসাদের পরে এত জনপ্রিয়তা মোদী ছাড়া আর কোনও রাজনৈতিক নেতা পাননি। পূর্বোক্ত তিনজনের কাউকেই ভারতবর্ষ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পায়নি। মোদীকে পেয়েছে। অতএব এই তিনজনকে নিয়ে দেশবাসীর যে অতৃপ্ত স্বপ্ন আছে তা এবার পূর্ণ করতে পারবেন নরেন্দ্র মোদী।

# রিগিং দক্ষতার ফল প্রকাশ রাজ্যে গেরুয়া ঝড়ে ফুঁসছে মানুষ

**সাধন কুমার পাল**

২০১৪-এর লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হতেই ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস এতটাই বেসামাল হয়ে পড়েছিল যে এই দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনৈতিক জবাব দেওয়ার মতো ভারসাম্য হারিয়ে নরেন্দ্র মোদীকে তুই তুকারি করে আক্রমণ করা থেকে শুরু করে। নিজেদের হার নিশ্চিত জেনেও বিজেপিকে ঠেকাতে কংগ্রেসের তূণে নৈতিক অনৈতিক কোনো রকম অস্ত্রই পড়ে ছিল না। এ কথার বড় প্রমাণ হলো নির্বাচনের ফল প্রকাশের আগে কংগ্রেস নেতা রসিদ আলভি ঘোষণা করেছিল মোদীকে ঠেকাতে ওঁরা মমতাকে প্রধানমন্ত্রী পদে বসাতেও প্রস্তুত। খুব কাছে থেকে এবারের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করার অভিজ্ঞতা থেকে আমার মনে হয়েছে মমতা সেই সিপিএম স্টাইলে রিগিং ছাপ্পা চালিয়ে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করে এ রাজ্যে ভোটযন্ত্রে গেরুয়া ঝড়টিকে প্রবেশ করতে দেয়নি।

ইলোকট্রনিক মিডিয়ার সৌজন্যে গোটা বিশ্বের মানুষ দেখেছে গত ১২ মে পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দফা নির্বাচনের দিন মরিয়া হয়ে ওঠা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে না যাওয়ার জন্য ধমকাচ্ছে, শাসাচ্ছে বুথের ভিতর ঢুকে নজরদারি চালাচ্ছে, কোথাও বা বোতাম টিপে দিচ্ছে, কামদুনির একটি বুথে স্থানীয় এক তৃণমূল কংগ্রেস নেতা প্রিসাইডিং অফিসারের চেয়ারে বসে আছে আর প্রিসাইডিং অফিসার পাশের ঘরে বসে হাওয়া খাচ্ছেন। ভয় পেয়ে মানুষ যাতে ভোটকেন্দ্রমুখী না হয় সেজন্য খোদ কলকাতার বড়বাজারে বিজেপি নেত্রী মীনাদেবী পুরোহিতের মতো বিরোধী নেত্রীর বাড়ির সামনে সকালবেলা বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে। বিশেষ নির্বাচনী পর্যবেক্ষক সুধীরকুমার রাকেশ বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত গ্রামবাসীদের বুঝিয়ে-সুঝিয়েও বুথে আনতে পারেননি। গ্রামবাসীদের একটিই কথা আজ না হয় পুলিশ পাহারায় ভোট দিলাম কিন্তু পরে কি হবে?

১৩ মে নির্বাচনের পরের দিন দৈনিক স্টেটসম্যান এর কয়েকটি হেডলাইন, 'রক্ত ঝরল শেষ দফার ভোটে', 'জন সমর্থন হারাচ্ছে বলেই এতো সন্ত্রাস', 'বসিরহাট কেন্দ্রে বুথ দখল, বোমাবাজি ও গুলিতে আহত ২০', 'তৃণমূলের হামলায় আহত জওয়ান', কামদুনিতে প্রিসাইডিং অফিসারের চেয়ারে তৃণমূল নেতা'। একইদিনে আনন্দবাজারের হেডলাইন, 'প্রাণ ভয়ে চুপ পর্যবেক্ষক, শান্তির ভোট আমগাছিয়ায়', ১৩ তারিখের উত্তরবঙ্গ সংবাদের হেডলাইন, 'ভোট, সন্ত্রাসের শীর্ষে পশ্চিমবঙ্গ'। প্রহসনের এই নির্বাচনে সন্দেহে আঙুল উঠেছে নির্বাচন কমিশনের দিকেও। নির্বাচন চলাকালীন রিগিং ছাপ্পা ঠেকাতে ব্যর্থ বিশেষ নির্বাচনী পর্যবেক্ষক সুধীরকুমার রাকেশের সঙ্গে তৃণমূলের যোগাযোগের অভিযোগ উঠেছে। বিরোধী দলগুলি এই পর্যবেক্ষককে বারবার সরানোর দাবিতে সোচ্চার হয়েছে। সব মিলে বলা যায় মোদীঝড় ঠেকাতে কংগ্রেস-তৃণমূল ও সুধীরকুমার রাকেশের মতো নির্বাচন কমিশনের উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মতলববাজ আধিকারিকের জোট ভোটযন্ত্রে মানুষের মতামত অবাধ ভাবে প্রতিফলিত হতে দেয়নি।

খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়াতেও এটা আন্দাজ করতে অসুবিধে হয় না যে গণতন্ত্রহত্যার এই পাপ ধুয়ে ফেলতে তিনি গঙ্গাজলের আশ্রয় নিয়েছেন। বললেন, 'গঙ্গাজল হাতে নিয়ে বলতে পারি তৃণমূল কখনো রিগিং করে না।'

তৃণমূল কংগ্রেসের এই রিগিং প্রবণতা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বিপুল জনপ্রিয়তা নিয়ে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর, যখন নির্বাচন হলেই তৃণমূল কংগ্রেসের জয়ী হওয়ার কথা সেসময়ও এ রাজ্যে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচন, বিভিন্ন স্কুল পরিচালন সমিতির নির্বাচন, পুর নির্বাচন ও পঞ্চায়েত নির্বাচনকেও অবাধ হতে না দিয়ে জোর করে ক্ষমতা দখলের প্রবণতা দেখা গেছে। প্রথমে বিরোধীদের মনোনয়ন তুলতে না দেওয়া বা তুলে ফেললেও জমা দিতে না দেওয়া, সেটিও ঠেকানো না গেলে শেষে সরাসরি রিগিং ছাপ্পা চালিয়ে ভোটে জেতার প্রবণতা স্পষ্ট দেখা গেছে।

পুলিশ ও প্রশাসনের অন্দর মহলে কান পাতলেও শোনা যাবে যে কোনো ধরনের স্থানীয় নির্বাচনে যেনতেন প্রকারেণ তৃণমূলকে জেতানোর অলিখিত চাপ মমতা জমানার স্বাভাবিক ব্যাপার। পরিবর্তনের পর তৃণমূল নেত্রী বলতেন বদলা নয় বদল চাই। টেনশন হলে রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনুন। বাস্তবে তৃণমূলের নির্বাচনী রাজনীতি দেখে এটা বলতে হয় যে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একথা বলতেন না। বদলা নিয়ে সিপিএমের রিগিং মেশিনারি নষ্ট না করে সেটির লাল রং পাল্টে সবুজ রং করে নিয়ে নির্বাচনগুলিতে জয় নিশ্চিন্ত করে সর্বেসর্বা হয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই শ্লোগানের জন্ম দিয়েছিলেন। সব মিলে বলা যায় এবারের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস, তৃণমূলও নির্বাচন কমিশনের কতিপয় আধিকারিকের অশুভ আঁতাত এরাজ্যের গেরুয়া ঝড়কে ভোটযন্ত্রে প্রবেশ করতে দেয়নি। তবে মানুষের সঙ্গে কথা বললেই বোঝা যাবে এই ঝড় ভোটযন্ত্রে প্রবেশ করতে না পারলেও ভোটারদের মনের ভেতর ক্রমেই শক্তি সঞ্চয় করছে। ভবিষ্যতে এই ঝড় যখন আরো প্রবল আকারে আছড়ে পড়বে সেদিন মমতাকেও সিপিএমের মতো খড়কুটার মতো ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

# সদ্যসমাপ্ত লোকসভা ভোটের ফলাফলের নিরিখে রাজ্যের ২১টি বিধানসভা কেন্দ্রে এগিয়ে বিজেপি

**নিজস্ব প্রতিনিধি।।** গোটা দেশের প্রবণতার সঙ্গে তাল রেখে মোদী-হাওয়া এ রাজ্যেও প্রবেশ করেছে। দার্জিলিঙের বাইরে আরও একটি আসন আসানসোল জিতেছে বিজেপি। তাদের ভোটের হার ৩.৩৬ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ১৭ শতাংশ। যা এখনও প্রাপ্ত তাদের সর্বাধিক ভোট। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ভোট পেয়েছে ৮৭ লক্ষ। বিজেপি-র এই উত্থান তৃণমূলকে গভীর চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। যদিও এরাজ্যে ৪২টি আসনের মধ্যে ৩৪টি লোকসভা আসনই জিতেছে তৃণমূল। শাসক দল তৃণমূল পেয়েছে ৩৯.১ শতাংশ ভোট। গতবার নিজেদের ১৯-টির সঙ্গে কংগ্রেস এবং এস ইউ সি-র জোট ধরে তাদের মোট আসন ছিল ২৬টি।

বিজেপি-র ভোট বাড়ায় এরাজ্যে কুপোকাৎ হয়েছে বরং বামেরা। সেই ১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচন থেকে ধরলে এবারেই রাজ্যে বামেদের ফল সব থেকে শোচনীয়। শুধু রায়গঞ্জ ও মুর্শিদাবাদ আসন দুটি জিততে পেরেছে সিপিএম। কম আসন পাওয়ার থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ হলো— ভোট প্রাপ্তির নিরিখে গত বেশ কয়েকটি নির্বাচনের মতো এবারেও সেই ধারা অব্যাহত। গত বিধানসভা ভোটে বামেরা যেখানে ৪১ শতাংশ ভোট পেয়েছিল, সেখানে এই লোকসভায় সেই ভোট কমে দাঁড়িয়েছে ২৯ শতাংশে। গত বছর পঞ্চায়েত ভোটে বামেরা গড়ে ভোট পেয়েছিল প্রায় ৩৭ শতাংশ। তথাকথিত বাম ঘাঁটি বলে কিছুই যে আর রাজ্যে অবশিষ্ঠ নেই, এবার জলপাইগুড়ির মতো লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের জয় থেকেই সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট।

এদিক থেকে দেখলে তুলনায় কংগ্রেসের ফল ভালো। গতবারের ৬টি আসনের মধ্যে ২টি আসন খুইয়েছে তারা। হেরেছেন রায়গঞ্জ কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দীপা দাশমুন্সি এবং মুর্শিদাবাদের সাংসদ মান্নান হোসেন। তবু দেশ জুড়ে প্রবল কংগ্রেস বিরোধী ঝড়ের মুখে মালদহ ও মুর্শিদাবাদে নিজেদের গড় অনেকটাই সামলাতে পেরেছে অধীর চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন প্রদেশ কংগ্রেস। অধীর নিজেই জিতেছেন সাড়ে তিন লক্ষের বেশি

ভোটে। রাজ্যে তাদের ভোট এবার ৯.৬ শতাংশ। জঙ্গিপুর কেন্দ্রে ২০১২ সালের উপনির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী দেয়নি। তখন মাত্র আড়াই হাজার ভোটে জিতেছিলেন রাষ্ট্রপতি-পুত্র অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। এবার তৃণমূল, বিজেপি এবং বামেদের সঙ্গে লড়ে তাঁর জয় ৮ হাজার ভোটে। এদিক থেকে শেষ মুহূর্তে প্রদেশ সভাপতির দায়িত্ব নিয়ে অধীর চৌধুরী অনেকটাই রক্ষা করলেন রাজ্যের কংগ্রেসের অস্তিত্ব।

বামেদের ধরাশায়ী অবস্থা, কংগ্রেসের কোনোক্রমে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা, অন্যদিকে সারদা থেকে টেট কেলেঙ্কারি, ভোটের আগে শাসকদলকে জড়িয়ে পরপর দুর্নীতির অভিযোগও যে তৃণমূলের গায়ে তেমন আঁচড় কাটতে পারেনি— তার রহস্যটা কি? রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে এর অন্যতম কারণ এরাজ্যে সংখ্যালঘু মুসলমানদের কৌশলগত অবস্থান। রাজ্যে মোট সংখ্যালঘু ভোট এখন প্রায় ২৯ শতাংশ। যেখানে যাদের সঙ্গে থাকলে নিজেদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত মনে হয়, সেখানে তাদেরই সমর্থন করেছেন মুসলমানরা। মালদহ ও মুর্শিদাবাদে ওই ভোট যেমন কংগ্রেস পেয়েছে, দক্ষিণবঙ্গে তার সিংহভাগই পেয়েছে তৃণমূল।

কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে, ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে সারাদেশে মুসলমান অধ্যুষিত ১০২টি আসনে জিতেছে বিজেপি ও তার শরিকদল ৫৫টি আসনে জিতেছে। অর্থাৎ সেইসব আসনে বিজেপি ও তার শরিকদলকে ভোট দিয়েছেন মুসলমানরা। তাই এর পুনরাবৃত্তি যে এ রাজ্যে হবে না— সেটা ভাবার কোনো কারণ নেই।

রাজ্যে এই ভোটের ফলাফলে রাজ্য বিজেপি যথেষ্ট উজ্জীবিত। পরিসংখ্যান বলছে, লোকসভা ভোটের ফলকে বিধানসভা কেন্দ্রওয়াড়ি ধরলে ২৪টি আসনে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। যদি এর মধ্যে পাহাড়ের দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং— তিনটি বিধানসভা ক্ষেত্র ছেড়ে দেওয়া যায় তবে এই সংখ্যাটা হবে ২১। লোকসভা ভোটের নিরিখে এই বিধানসভা কেন্দ্রগুলি হলো--- খড়্গপুর সদর, শ্রীরামপুর, ভাটপাড়া, জোড়াসাঁকো, ভবানীপুর, বিধাননগর, রাণিগঞ্জ, বারবনি, কুলটি, আসানসোল-উত্তর, আসানসোল দক্ষিণ, বসিরহাট দক্ষিণ, কৃষ্ণনগর উত্তর, ইংরেজবাজার, ইসলামপুর, ফাঁসিদেওয়া, নাগরাকাটা, কালচিনি, মাদারিহাট, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি। কয়েকমাস পরেই আসানসোল ও কুলটি পুরসভা এবং আগামী বছরে কলকাতা পুরসভার ভোট। কলকাতা পুরসভার ১৪১টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৩৭টি ওয়ার্ডে এগিয়ে আছে বিজেপি।

# লোকসভা নির্বাচন - ২০১৪

**পশ্চিমবঙ্গে ফলাফল** *(* বিজয়ী প্রার্থী)*

| লোকসভা কেন্দ্র | বিজেপি প্রার্থী | তৃণমূল প্রার্থী | বামফ্রন্ট প্রার্থী | কংগ্রেস প্রার্থী |
|---|---|---|---|---|
| ১. কোচবিহার | হেমচন্দ্র বর্মণ | রেণুকা সিনহা* | দীপককুমার রায় | কেশবচন্দ্র রায় |
| | ২,১৭,৬৫৩ | ৫,২৬,৪৯৯ | ৪,৩৯,৩৯২ | ৭৪,৫৪০ |
| ২. আলিপুরদুয়ার | বীরেন্দ্র বোরা ওঁরাও | দশরথ তিরকে* | মনোহর তিরকে | জোসেফ মুন্ডা |
| | ৩,৩৫,৮৫৭ | ৩,৬২,৪৫৩ | ৩,৪১,০৫৬ | ১,১৬,৭১৮ |
| ৩. জলপাইগুড়ি | সত্যলাল সরকার | বিজয়চন্দ্র বর্মন* | মহেন্দ্রকুমার রায় | সুখবিলাস বর্মা |
| | ২,২১,৫৯৩ | ৪,৯৪,৭৭৩ | ৪,২৫,১৬৭ | ৮৭,৫৮৮ |
| ৪. দার্জিলিং | এস এস আলুওয়ালিয়া* | বাইচুং ভুটিয়া | সুমন পাঠক | সুজয় ঘটক |
| | ৪,৮৮,২৫৭ | ২,৯১,০১৮ | ১,৬৭,১৮৬ | ৯০,০৭৬ |
| ৫. রায়গঞ্জ | নিমু ভৌমিক | সত্যরঞ্জন দাশমুন্সি | মহম্মদ সেলিম* | দীপা দাশমুন্সি |
| | ২,০৩,১৩১ | ১,৯২,৬৯৮ | ৩,১৭,৫১৫ | ৩,১৫,৮৮১ |
| ৬. বালুরঘাট | বিশ্বপ্রিয় চৌধুরি | অর্পিতা ঘোষ* | বিমল সরকার | ওমপ্রকাশ মিশ্র |
| | ২,২৩,০১৪ | ৪,০৯,৬৪১ | ৩,০২,৬৭৭ | ৮০,৭১৫ |
| ৭. মালদহ উত্তর | সুভাষ কে গোস্বামী | সৌমিত্র রায় | খগেন মুর্মু | মৌসম বেনজির নুর* |
| | ১,৭৯,০০০ | ১,৯৭,৩১৩ | ৩,২২,৯০৪ | ৩,৮৮,৬০৯ |
| ৮. মালদহ দক্ষিণ | বিষ্ণুপদ রায় | মোয়াজ্জিম হোসেন | এ হাসনাত খান | এ এইচ খান চৌধুরি* |
| | ২,১৬,১৮০ | ১,৯২,৬৩২ | ২,০৯,৪৮০ | ৩,৮০,২৯১ |
| ৯. জঙ্গিপুর | সম্রাট ঘোষ | হাজি নুরুল ইসলাম | মুজাফ্ফর হোসেন | অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়* |
| | ৯৬,৭৫১ | ২,০৭,৪৫৫ | ৩,৭০,০৪০ | ৩,৭৮,২০১ |
| ১০. বহরমপুর | দেবেশ অধিকারী | ইন্দ্রনীল সেন | প্রমথেশ মুখোপাধ্যায় | অধীররঞ্জন চৌধুরি* |
| | ৮১,৬৫৬ | ২,২৬,৯৮২ | ২,২৫,৬৯৯ | ৫,৮৩,৫৪৯ |
| ১১. মুর্শিদাবাদ | সুজিতকুমার ঘোষ | মহম্মদ আলি | বদরুজ্জা খান* | মান্নান হোসেন |
| | ১,০১,০৬৯ | ২,৮৯,০২৭ | ৪,২৬,৯৪৭ | ৪,০৮,৪৯৪ |
| ১২. কৃষ্ণনগর | সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় | তাপস পাল* | শান্তনু ঝা | রাজিয়া আহমেদ |
| | ৩,২৯,৭৮৭ | ৪,৩৮,৭৮৯ | ৩,৬৭,৫৩৪ | ৭৪,৭৮৯ |
| ১৩. রানাঘাট | সুপ্রভাত বিশ্বাস | তাপস মণ্ডল* | অর্চনা বিশ্বাস | প্রতাপকান্তি রায় |
| | ২,৩৩,৬৭০ | ৫,৯০,৪৫১ | ৩,৮৮,৬৮৪ | ৯২,২১৮ |
| ১৪. বনগাঁ | কে ডি বিশ্বাস | কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর* | দেবেশ দাস | ইলা মণ্ডল |
| | ২,৪৪,৭৮৩ | ৫,৫১,২১৩ | ৪,০৪,৬১২ | ৪৩,৮৬৬ |
| ১৫. বারাকপুর | আর কে হান্ডা | দীনেশ ত্রিবেদি* | সুভাষিণী আলি | সম্রাট তপাদার |
| | ২,৩০,৪০১ | ৪,৭৯,২০৬ | ২,৭২,৪৩৩ | ৩০,৪৯১ |
| ১৬. দমদম | তপন সিকদার | সৌগত রায়* | অসীম দাশগুপ্ত | ধনঞ্জয় মিত্র |
| | ২,৫৪,৮১৯ | ৪,৮৩,২৪৪ | ৩,২৮,৩১০ | ৩৪,১১৬ |
| ১৭. বসিরহাট | শমীক ভট্টাচার্য | ইদ্রিশ আলি* | নুরুল হুদা | কাজি আবদুল রহিম |
| | ২,৩৩,৮৮৭ | ৪,৯২,৩২৬ | ৩,৮২,৬৬৭ | ১,০২,১৩০ |
| ১৮. বারাসাত | পি সি সরকার | কাকলি ঘোষদস্তিদার* | মোর্তাজা হোসেন | ঋজু ঘোষাল |
| | ২,৯৬,৬০৮ | ৫,২৫,৩৮৭ | ৩,৫২,২৪৬ | ৪০,৬৬০ |
| ১৯. জয়নগর | কে পি মজুমদার | প্রতিমা নস্কর* | সুভাষ নস্কর | অর্ণব রায় |
| | ১,১৩,২০৬ | ৪,৯৪,৭৪৬ | ৩,৮৬,৩৬২ | ৩৮,৪৯৩ |
| ২০. মথুরাপুর | তপন নস্কর | সি এম জাটুয়া* | রিঙ্কু নস্কর | মনোরঞ্জন হালদার |
| | ৬৫,৯৬৫ | ৬,২৭,৭৬১ | ৪,৮৯,৩২৫ | ৪৭,২৭৭ |
| ২১. ডায়মন্ডহারবার | অভিজিৎ দাস | অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়* | আবুল হাসনাত | এম কিউ কোমার |
| | ২,০০,৮৫৮ | ৫,০৮,৪৮১ | ৪,৩৭,১৮৩ | ৬৩,০৪৭ |
| ২২. যাদবপুর | স্বরূপপ্রসাদ ঘোষ | সুগত বসু* | সুজন চক্রবর্তী | সমীর আইচ |
| | ১,৫৫,৫১১ | ৫,৮৪,২৪৪ | ৪,৫৯,০৪১ | ২৬,৩৪৪ |

# লোকসভা নির্বাচন - ২০১৪

**পশ্চিমবঙ্গের ফলাফল** *(* বিজয়ী প্রার্থী)*

| লোকসভা কেন্দ্র | বিজেপি প্রার্থী | তৃণমূল প্রার্থী | বামফ্রন্ট প্রার্থী | কংগ্রেস প্রার্থী |
|---|---|---|---|---|
| ২৩. কলকাতা দক্ষিণ | তথাগত রায়<br>২,৯৫,৩৭৬ | সুব্রত বক্সি*<br>৪,৩১,৭১৫ | নন্দিনী মুখোপাধ্যায়<br>২,৭৮,৪১৪ | মালা রায়<br>১,১৩,৪৫৩ |
| ২৪. কলকাতা উত্তর | রাহুল সিনহা<br>২,৪৭,৪৬১ | সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়*<br>৩,৪৩,৬৮৭ | রূপা বাগচি<br>১,৯৬,০৫৩ | সোমেন মিত্র<br>১,৩০,৭৮৩ |
| ২৫. হাওড়া | জর্জ বেকার<br>২,৮৪,১২০ | প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়*<br>৪,৮৮,৪৬১ | শ্রীদীপ ভট্টাচার্য<br>২,৯১,৫০৫ | মনোজ পান্ডে<br>৬৩,২৫৪ |
| ২৬. উলুবেড়িয়া | আর কে মোহান্তি<br>১,৩৭,১৩৭ | সুলতান আহমেদ*<br>৫,৭০,৭৮৫ | সাবিরুদ্দিন মোল্লা<br>৩,৬৯,৫৬৩ | অসিত মিত্র<br>৬৭,৮২৬ |
| ২৭. শ্রীরামপুর | বাপ্পি লাহিড়ি<br>২,৮৭,৭১২ | কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়*<br>৫,১৪,৯৩৩ | তীর্থঙ্কর রায়<br>৩,৬২,৪০৭ | আবদুল মান্নান<br>৮৬,০৯৯ |
| ২৮. হুগলি | চন্দন মিত্র<br>২,২১,২৭১ | রত্না দে*<br>৬,১৪,৩১২ | প্রদীপ সাহা<br>৪,২৫,২২৮ | প্রীতম ঘোষ<br>৪২,২২৬ |
| ২৯. আরামবাগ | মধুসুদন বাগ<br>১,৫৮,৪৮০ | অপরূপা পোদ্দার*<br>৭,৪৮,৭৬৪ | শক্তিমোহন মালিক<br>৪,০১,৯১৯ | শম্ভু মালিক<br>২৭,৮৭২ |
| ৩০. তমলুক | বাদশা আলম<br>৮৬,২৬৫ | শুভেন্দু অধিকারী*<br>৭,১৬,৯২৮ | সেখ ইব্রাহিম আলি<br>৪,৭০,৪৪৭ | সেখ আনোয়ার আলি<br>২৮,৬৪৫ |
| ৩১. কাঁথি | কমলেন্দু পাহাড়ি<br>১,১১,০৮২ | শিশির অধিকারী*<br>৬,৭৬,৭৪৯ | তাপস সিনহা<br>৪,৪৭,৪৪৭ | কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায়<br>২৭.২৩০ |
| ৩২. ঘাটাল | মহম্মদ আলম<br>৯৪,৮৪২ | দীপক অধিকারী*<br>৬,৮৫,৬৯৬ | সন্তোষ রাণা<br>৪,২৪,৮০৫ | মানসরঞ্জন ভুঁইঞা<br>১,২২,৯২৮ |
| ৩৩. ঝাড়গ্রাম | বিকাশ মুদি<br>১,২২,৪৫৯ | উমা সোরেন*<br>৬,৭৪,৫০৪ | পুলিনবিহারী বাস্কে<br>৩,২৬,৬২১ | অনীতা হাঁসদা<br>৪০,৫১৩ |
| ৩৪. মেদিনীপুর | প্রভাকর তেওয়ারি<br>১,৮০১১২ | সন্ধ্যা রায়*<br>৫,৭৯,৮৬০ | প্রবোধ পান্ডা<br>৩,৯৫,১৯৪ | বিমল রাজ<br>৪৮,৮৮৩ |
| ৩৫. পুরুলিয়া | বিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়<br>৮৬,২৩৬ | মৃগাঙ্ক মাহাতো*<br>৪,৬৮,২৭৭ | নরহরি মাহাতো<br>৩,১৪,৪০০ | নেপাল মাহাতো<br>২,৫৭,৯২৩ |
| ৩৬. বাঁকুড়া | সুভাষ সরকার<br>২,৫১,১৮৩ | মুনমুন সেন*<br>৪,৮৩,৪৫৫ | বাসুদেব আচারিয়া<br>৩,৮৪,৯৪৯ | নীলমাধব গুপ্তা<br>২২,০২১ |
| ৩৭. বিষ্ণুপুর | জয়ন্ত মণ্ডল<br>১,৭৯,৫৩০ | সৌমিত্র খান*<br>৫,৭৮,৮৭০ | সুস্মিতা বাউরি<br>৪,২৯,১৮৫ | নারায়ণচন্দ্র খান<br>২৭,০৫৪ |
| ৩৮. বর্ধমান পূর্ব | সন্তোষ রায়<br>১,৭৯,৮২৮ | সুনীল মণ্ডল*<br>৫,৭৪,৬৬০ | ঈশ্বরচন্দ্র দাস<br>৪,৬০,১৮১ | চন্দনা মাঝি<br>৬৮,৮৮৪ |
| ৩৯. বর্ধমান দুর্গাপুর | দেবশ্রী চৌধুরি<br>২,৩৭,২০৫ | মুমতাজ সংঘমিত্রা*<br>৫,৫৪,৫২১ | সেখ সাইদুল হক<br>৪,৪৭,১৯০ | প্রদীপ অগস্তি<br>৪৪,৩৫৫ |
| ৪০. আসানসোল | বাবুল সুপ্রিয়*<br>৪,১৯,৯৮৩ | দোলা সেন<br>৩,৪৯,৫০৩ | বংশগোপাল চৌধুরি<br>২,৫৫,৮২৯ | ইন্দ্রাণী মিশ্র<br>৪৮,৫০২ |
| ৪১. বোলপুর | কামিনীমোহন সরকার<br>১,৯৭,৪৭৪ | অনুপম হাজরা*<br>৬,৩০,৬৯৩ | রামচন্দ্র ডোম<br>৩,৯৪,৫৮১ | তপনকুমার সাহা<br>৪৬,৯৫৩ |
| ৪২. বীরভূম | জয় বন্দ্যোপাধ্যায়<br>২,৩৫,৭৫৩ | শতাব্দী রায়*<br>৪,৬০,৫৬৮ | কামরে এলাহী<br>৩,৯৩,৩০৫ | সয়েদ সিরাজ জিন্মি<br>১,৩২,০৮৪ |

## DAS STEEL UDDYOG

Naldubi, Mangalbari, Po.+Dist. : Malda

সকল প্রকার স্টীল ফার্ণিচার,
গ্রীলগেট এবং ফেব্রিকেশনের
কাজ করা হয়

Show Room
—ঃ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ—

GEETANJALI FURNITURE
Jhaljhalia, Station Road, Malda
Phone : 03512-266063,
Mobile : 9733387091

**Ori Plast**

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

*Authrorised Distributor :*

**NATIONAL PIPE & SANITERY STORES**

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

**PARTHA SARATHI CERAMICS**

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986


“এশিয়া যেমন জগতের ধর্ম ও নীতির প্রসূতি, ভারতও তেমনি এশিয়ার আদর্শসমূহের জন্মদাত্রী। ভারত যদি নিজের প্রতি বিশ্বস্ত না থাকত, যে গভীর তত্ত্বগুলি শোনার জন্য সমগ্র জগৎ অপেক্ষা করছিল, সেকথা শোনাবার অপর কেউ থাকত না।”

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

# চিঠিপত্র

## দেশদ্রোহী

গত ২ মার্চ ২০১৪, বাংলাদেশ আয়োজিত এশিয়া কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় ভারত মুখোমুখি হয়েছিল চির প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের এবং সেই খেলায় চরম উত্তেজনার মধ্য দিয়ে সামান্য ব্যবধানে ভারত পরাজিত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে কিছু কাশ্মীরি যুবক যারা কাশ্মীর থেকে উত্তরপ্রদেশে পড়াশোনার জন্য এসেছিল, তারাও ওই ম্যাচ দেখে এবং ভারত হেরে যাওয়ায় খুব খুশি হয়ে সারারাত্রি হৈচৈ ও আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠে। এই ঘটনার প্রতিবাদ করে উত্তরপ্রদেশের মেরঠের স্বামী বিবেকানন্দ শুভার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা কাশ্মীরি ছাত্রদের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে এবং পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়, পরে পুলিশ ওই কাশ্মীরি ছাত্রদের গ্রেপ্তার করে।

আপামর ভারতবাসী-সহ আমিও টেলিভিশনে সেই খেলা দেখেছি এবং আমাদের দেশ হেরে যাওয়ায় গভীর ভাবে হতাশ হয়ে পড়ি।

এখন প্রশ্ন হলো, কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং ভারতবর্ষের একটি অন্যতম অঙ্গরাজ্য। বহু সুযোগ সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও কাশ্মীরের জনগণ পাকিস্তানের হয়ে কেন কথা বলবে? ভারতের অন্যান্য রাজ্যে জঙ্গি হানা হলে বা কোনো বিপর্যয় ঘটলে তারা দুই হাত তুলে নৃত্য করতে শুরু করে। এর আগেও আমরা দেখেছি ভারত-পাকিস্তান যে কোনো খেলা বিশেষ করে ক্রিকেট খেলা হলে কাশ্মীরের মানুষ পুরোদমে পাকিস্তানের হয়ে গলা ফাটায়। এবং দুর্ভাগ্যক্রমে ভারত হেরে গেলে তারা বাজি পোড়ায়, বোমা ফাটায় এমনকী পাকিস্তানের পতাকা নিয়ে উৎসব করে বেড়ায়। তারা মনে করে পাকিস্তান-ই তাদের নিজের দেশ।

জম্মু-কাশ্মীরের গত বিধানসভা নির্বাচনে নির্বাচন কভার করতে গিয়েছিলেন কলকাতার বেশ কিছু সাংবাদিক। তাঁরা যখন নির্বাচনী বিষয়ে কাশ্মীরের জনগণের সঙ্গে কথা বলছেন, সেই সময় হঠাৎ-ই একজন কাশ্মীরি একজন সাংবাদিককে জিজ্ঞেস করে বসেন--- আপনি কী ইন্ডিয়ান? কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যান উক্ত সাংবাদিক এই কথা শুনে।

এই ধরনের অসাংবিধানিক কথাবার্তা ও আচরণ কোনোমতেই মেনে নেওয়া যায় না। ভারতবর্ষ আমাদের দেশ। এই চির-সত্যটা ভুলে গিয়ে যারা অন্য দেশের গুণগান করবে তারা দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক। তাদের ঠাঁই আর কোথাও হোক বা না হোক ভারতবর্ষে হতে পারবে না।

—**নরেশ মল্লিক,**
পূর্বস্থলী ২, বর্ধমান।

## কুরু-পাণ্ডবরা কি 'ভরত' গোষ্ঠীর বংশধর?

বিদ্যালয়ের পাঠ্য ইতিহাস থেকে জানা যায়, ঋক্‌বেদের যুগে আর্যদের কতকগুলি পরিবার রক্ত সম্পর্কে যুক্ত হলে গোষ্ঠী বা উপজাতি গঠিত হোত। এই গোষ্ঠী বা উপজাতিগুলির বিভিন্ন নাম ছিল। যথা— যদু, অনু, গুরু, ভূর্তসা, ভরত প্রভৃতি। ঋক্‌বেদে দশ রাজার যুদ্ধের ঘটনা হতে জানা যায়, রাজা দিবোদাসের পুত্র রাজা সুদাম ছিলেন ভরত গোষ্ঠীর রাজা। এই যুদ্ধে ভরত বা ভারত গোষ্ঠীর জয়লাভ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

উল্লেখ্য, গীতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের দশম শ্লোকে ধৃতরাষ্ট্রকে 'ভারত' নামে সম্বোধন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে 'ভারত' এর অর্থ ভরতবংশীয় ধৃতরাষ্ট্র। এরপর সারা গীতা জুড়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ১৭ বার 'ভারত' (ভরতবংশী অর্জুন) নামে সম্বোধন করেছেন। এছাড়া অর্জুনকে ভরতর্ষভ, ভরতশ্রেষ্ঠ, কুরুসত্তম, কুরুশ্রেষ্ঠ এবং পাণ্ডব হিসেবেও শ্রীকৃষ্ণ সম্বোধন করেছেন।

এ অবস্থায় প্রশ্ন জাগে— মহাভারতের কুরু-পাণ্ডবরা কি ঋকবেদে বর্ণিত 'ভরত' গোষ্ঠীর বংশধর? এ প্রসঙ্গে কেউ আলোকপাত করলে উপকৃত হব।

—**রাজকুমার জাজোদিয়া,**
কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

## আদিখ্যেতার সীমা থাকা উচিত

আমরা দিন দিন অতি উৎসাহী হয়ে উঠছি, শুধু তাই নয় হুজুগেও মেতে উঠছি। আমরা নিজ ধর্মের যে-কোনো অনুষ্ঠানে বীতরাগ হয়ে পরধর্মের অনুষ্ঠানে এত উৎসাহী শুধু নয়, অর্থের অপচয় করতেও কার্পণ্য করি না।

খৃস্টমাস উপলক্ষে আমরা ২৫ ডিসেম্বর মাতামাতি করি, খাওয়া-দাওয়া গান-বাজনা সহকারে উদ্‌যাপন করি। কিন্তু কোনো দেশের জনগণ কি ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জন্মদিন পালন করে? খাওয়া-দাওয়া, গান-বাজনা করে? করে না। এই মর্মেই হালফিল ইংরাজি নববর্ষ পালন করার হুজুগ ও আদিখ্যেতা দেখে একটা কথা মনে পড়ে গেল যা হলো তাই জানাচ্ছি।

প্রত্যেকবার ৩১ ডিসেম্বর রাত্রি ১২টা বাজার পর থেকে দেশের উদ্দাম উচ্ছল জনগণ তিন থেকে তিরাশি বছরের সকলে বিগত ২০০ বছর ধরে যারা ভারতীয়দের পরাধীন করে রেখেছিল তাদের নবর্ষ পালন করে। অথচ দেখতে পাওয়া যায় না ১৪ আগস্ট রাত্রি বারোটার পর 'ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট' পালন করতে। তারা কিন্তু ১ জানুয়ারি পিকনিক করতে যাবার পূর্বে কোনো অজুহাত খাড়া করে না। এসব দেখে মনে হয় আদিখ্যেতার একটা সীমা থাকা উচিত। একটা কথা মনে পড়ে গেল। ''ইংরাজ তুমি ফিরে এসো, পরাধীনতা আমার জন্মগত অধিকার।'' সত্যি কি বিচিত্র এই দেশ!!!

—**দেবপ্রসাদ সরকার,** মেমারী।

# ভারতে ধর্মান্তরকরণ

**অধ্যাপক কৃষ্ণকান্ত সরকার**

মহম্মদ নাসিরুদ্দিন মণ্ডল লিখেছেন, 'ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসার কখনও অস্ত্রের দ্বারা হয়নি। আদর্শের মাধ্যমেই তা প্রচারিত হয়েছে' (কলম, ১৮.৪.২০১৩, পৃ. ১০)। আমাদের দেশে ছাপা অক্ষরে যা লেখা হয় অনেকেই তার সত্যতা যাচাই না করে বিশ্বাস করেন। আমাদের সংস্কৃতি সত্যানুসন্ধান। অসত্য থেকে সত্যে পৌঁছানোর চেষ্টা।

আমরা যে ইতিহাস পড়েছি সেই ইতিহাসে ভারতবর্ষে ইসলামের বিস্তার ও প্রসার কিভাবে হয়েছে সে বিষয়ে ধারাবাহিক ও সুসংবদ্ধ আকারে আলোচনা নেই। ইসলাম বিস্তার কীভাবে হয়েছে সে বিষয়ে কিছু তথ্য দেওয়ার এখানে প্রয়োজন রয়েছে, কারণ মহম্মদ নাসিরুদ্দিন যা প্রচার করছেন তা আদৌ সত্য কিনা তা পাঠক যাতে বিচার করতে পারেন।

(১) ৭১১ সালে মহম্মদ বিন কাসিম সিন্ধুর দেবল বন্দর দখল করে বলপূর্বক ব্রাহ্মণদের সুন্নত করে মুসলমান করতে চেষ্টা করলে ব্রাহ্মণেরা বাধা দিলে তিনি ১৭ বছরের ঊর্ধ্বের সকলকে হত্যা করতে এবং স্ত্রীলোক ও শিশুদের ক্রীতদাস করতে আদেশ দেন। 'Mahommad bin Qasim's first act of religious zeal was forcibly to circumcise the Brahmins of the captured city of Debul; but on discovering that they objected to this sort of conversion he proceeded to put all above the age of 17 to death and order all others, with women and children, to be led into slavery ' Dr. B. R. Ambedkar, Writings and Speeches, v. 8, p. 57.

(২) তৈমুরের ভারত অভিযান চলে ১৩৯৮-৯৯ সালে। তৈমুরের ভারতে অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল পৌত্তলিকদের বিনাশ করে ইসলাম বিস্তার করা —একথা উল্লেখ আছে তার আত্মজীবনীতে।

ভারতের একটি পার্বত্য জাতির নাম কাতোর। তৈমুর তাদের আক্রমণ ও পরাজিত করে নির্দেশ দেয় : 'যদি তারা বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করতে সম্মত হয় এবং মুসলমান হয়ে কলমা পাঠ করে, অন্যথায় আমি তাদের প্রত্যেককে একেবারে ধ্বংস করব।' তৈমুর আসছে, খবর শুনেই তারাসুতিনগরটি ফাঁকা করে সব মানুষ পালিয়ে যায় কিন্তু তৈমুরের অশ্বারোহীরা তাদের ধরে হত্যা করে তাদের নারী শিশুদের ধরে নিয়ে এলো, তারা মুসলমান হলো এবং কলমা পাঠ করল। 'যুদ্ধে আহত জম্মুর রাজার দিকে আমার (তৈমুরের) চোখ পড়ামাত্র ভীতি তার হৃদয়কে অধিকার করল। সে জানাল যে আমি (তৈমুর) যদি তাকে হত্যা না করি তবে কিছু পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে ও মুসলমান হতে সম্মত। আমি (তৈমুর) তৎক্ষণাৎ আদেশ দিলাম যে তাকে ধর্মের মর্মবাক্য শিক্ষা দেওয়া হোক। এই মর্মবাক্য উচ্চারণ করে সে ইসলামে দীক্ষিত হলো (গোপাল গোবিন্দ সেনগুপ্ত (অনুবাদক) তৈমুরের আত্মজীবনী, পৃ.১, ৩-৪, ৩৪, ৮০) মূল ইংরেজি Elliot & Dowson, History)

আওরঙ্গজেবের রাজত্বে গরিব হিন্দুর উপর জিজিয়া কর ছিল খুব বেশি। আয়ের শতকরা ৬ শতাংশ কিন্তু ধনীদের ক্ষেত্রে ১০০০ টাকা প্রতি আয়ে ২.৫০ টাকা মাত্র। গরিবদের উপরে বেশি কর ধার্য করার উদ্দেশ্য হলো— বেশি পরিমাণে গরিব হিন্দুর উপরে আর্থিক চাপ সৃষ্টি করে বেশি সংখ্যায় মুসলমান করার চেষ্টা করা। ১৬৭৯ খৃস্টাব্দে ২ এপ্রিল থেকে সম্রাট হিন্দুর উপর জিজিয়া ধার্য করলে ওই কর দিতে অক্ষম হয়ে বহু হিন্দু মুসলমান হয়েছিল— এঘটনা মানুচ্চি নামে বিদেশী পর্যটক প্রত্যক্ষ করে লিখেছেন ('Many Hindus who were unable to pay turned Muhammadan'-- Quoted in J.N. Sarkar, A Short History of Auranzib, p. 150)। বিদ্রোহে পরাজিতকে হত্যা করা এবং বিদ্রোহীর পরিবারকে মুসলমান করা হোত। যেমন জাঠ বিদ্রোহের নেতা গোকলা জাঠকে হত্যা করে তার পরিবারকে মুসলমান করা হয়। ১৬৭৫ খৃস্টাব্দে ১১ নভেম্বর গুরু তেগবাহাদুরের শিরশ্ছেদ করা হয় মুসলমান হতে অস্বীকার করার জন্য (Sarkar, op. cit, p. 207, Hughes, Dictionary of Islaim, p. 593)। বিদেশী গবেষক কে. গাফ্ লিখেছেন যে ১৮৩০ খৃস্টাব্দে মোপালা মুসলমান বিদ্রোহীরা ৫০০ হিন্দুকে হত্যা করে এবং ২৫০০ হিন্দুকে বলপূর্বক মুসলমান করে (See A.R. Desai, Peasant Struggles--India, OUP, p. 111)। বারবোসার (পর্তুগীজ পর্যটক) বিবরণ অনুসারে বাংলায় হিন্দুরা জীবিকার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকার জন্য বাধ্য হয়ে 'প্রতিদিন বাংলার অনেক হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত' (রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলা দেশের ইতিহাস, ২ : ৮৮)। বুকাননের বিবরণ অনুসারে 'জালালুদ্দিন অনেক হিন্দুকে জোর করিয়া মুসলমান করিয়াছিলেন' (ঐ, পৃ. ৪২)। জালালুদ্দিনের সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে জনৈক 'মৌলবি সমগ্র গ্রামের লোকদের মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করেন' (অতুল সুর, বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় পৃ. ৫৪-৫)।

১৮৩০ সালে বারাসাতে তিতুমীরের আন্দোলনে পুরা, সারগাছি রমেশচন্দ্রপুর, লাউহাটি গ্রামের হিন্দুকে বলপূর্বক মুসলমান করে মৌলবিরা (A. Dutta, Muslim Society এবং বিহারীলাল সরকার, তিতুমীর দেখুন)। ১৯৪৬ সালে নোয়াখালিতে এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে হিন্দুদের বলপূর্বক মুসলমান করার তথ্য বর্তমান লেখকের হাতে আছে।

## দশাবতার ও ভারতের জাতীয় জীবন

# কূর্মাবতার

**ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার**

ভগবান বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার কূর্ম। তিনি আপন পৃষ্ঠে মন্থনদণ্ড রূপ মন্দর পর্বত ধারণ করে দেবাসুরের সমুদ্রমন্থন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করেন। পুরাণে সমুদ্র মন্থন প্রসঙ্গেই কূর্মাবতারের কথা পাওয়া যায়। সমুদ্রমন্থন একটি রূপক কাহিনী। মানব হৃদয় সাগরের মতো বিশাল, গভীর ও নানা ভালো-মন্দ মিশ্র ধারণায় পরিপূর্ণ। এই ধারণাগুলিকে বিবেক-বুদ্ধির দ্বারা মন্থন করার মধ্য দিয়েই সমাজ সৃষ্টির উপযুক্ত দৃষ্টি লাভ করা যায়। ফলে সমষ্টির পারস্পরিক সহযোগী কাজের মধ্য দিয়ে সমাজ-জীবনে স্থিতি আসে। এভাবেই মর্ত্যমানব মাৎস্যন্যায়ের অরাজকতার বিনাশ থেকে রক্ষা পায় এবং এইভাবেই কীর্তিমান মানুষ সমাজে অমরত্ব লাভ করে। মৎস্যাবতারের কাহিনী বিশ্লেষণের সময় দেখা গেছে, সে যুগে দক্ষিণ অঞ্চলে নানা জাতির লোক বসবাস করতো, যাদের মধ্যে কোনো মৈত্রীভাব ছিল না; বরং সর্বদা সংঘর্ষ লেগেই থাকতো। কিন্তু সংস্কৃতির দিক থেকে এরা ছিল প্রথমশ্রেণীভুক্ত। তবে উত্তরাঞ্চলের মানুষ এদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সুসভ্য ছিল। এদের মধ্যেও দেব, যক্ষ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, পিশাচ, ভূত, মানব নানা প্রকারের মানুষ ছিল। সংস্কৃতির দিক থেকে এরাও ছিল সমশ্রেণীভুক্ত। এই সময় একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের ভৌগোলিক মিলনসাধন করল। উভয় অঞ্চলের মধ্যবর্তী সমুদ্র সরে গেল, আর দুই ভিন্ন সংস্কৃতির দেশ জুড়ে গিয়ে এক দেশে পরিণত হলো। এইভাবে ভিন্ন সংস্কৃতি ও ভিন্ন আঞ্চলিকতার দুটি মানবধারা এক দেশের অধিবাসী হয়ে গেল। এই সময় এদের পারস্পরিক সম্পর্ক যেমন গড়ে উঠতে লাগল, তেমন নিজেদের মধ্যে একটি ব্যবধানও এরা লক্ষ্য করল। ফলে নিজেদের মধ্যে একটা বিরোধ সম্ভবত সে সময় দেখা দিয়েছিল— যা দেবাসুরের সংগ্রাম নামে পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু দু'পক্ষেই বেশ কিছু মানুষ ছিল, যারা এই বিরোধ দূর করে সকলে মিলেমিশে থাকার মতো পরিবেশ তৈরি করেছিল। সর্বোপরি, ভৌগোলিক পরিবেশও সকলে মিলেমিশে থাকার অনুকূলেই ছিল। বিশাল দেশে সুখ-সমৃদ্ধির সকল উপাদানই ছিল। ফলে উভয়-পক্ষের নেতৃস্থানীয় বেশকিছু মানুষ দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যে যাতে সুসম্পর্ক বজায় থাকে এবং সুখে-শান্তিতে সকলেই জীবনযাপন করতে পারে তার জন্য আন্তরিকভাবে মনপ্রাণ খুলে যে আলোচনা করেছিল তারই পৌরাণিক সংস্করণ দেবাসুরের সমুদ্র মন্থন, অর্থাৎ হৃদয়মন্থন।

এই আলোচনায় বিচার-বিতর্কে সামঞ্জস্য বজায় রেখে সঠিক সিদ্ধান্ত নির্ণয় করার জন্য, অর্থাৎ এই আলোচনায় নেতৃত্ব দিতে একজন সর্বজনমান্য নেতার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল— তিনিই বিষ্ণুর কূর্মাবতার। আলোচনার আরম্ভেই দুই দলের বাদ-বিতণ্ডা প্রবল হয়ে উঠেছিল। পুরাণকার এই অবস্থাকে মন্থন দণ্ড মন্দর পর্বতের সমুদ্রে বসে যাওয়ার ঘটনা হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তারপর এই মহাসঙ্কট থেকে দেবাসুরকে উদ্ধার করলেন কূর্মাবতার। তিনি আপন পৃষ্ঠে মন্থনদণ্ড ধারণ করলেন; অর্থাৎ আলোচনায় অধ্যক্ষতা শুরু করলেন; মন্থন চলতে লাগলো, আলোচনা চলতে লাগলো। উভয়পক্ষ কূর্মাবতারকে আলোচনার অধ্যক্ষ হিসাবে স্বীকার করে নিল। কূর্মাবতার কচ্ছপের সকল গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি অধ্যবসায়ী, আশাবাদী ও বুদ্ধিমান। পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে এই অধ্যক্ষ দৃঢ় নিরপেক্ষতায় অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আপন কর্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন। পরিণামে মানবসাগর মন্থন করে সমাজ অমৃত লাভ করলো। পরস্পরের সহযোগে সকলের হিতচিন্তার সমন্বয়ই এই অমৃত। তাহলে গরল কী? সমুদ্র মন্থনে তো গরলও উঠেছিল। গরল হলো পরস্পরের আলোচনার মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ রূপ বিষাক্ত পরিবেশ সৃষ্টি। উভয়পক্ষের বিভিন্ন নেতা এই বিষাক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। কূর্মাবতার অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সেই বিষাক্ত পরিবেশ থেকে উভয়পক্ষকে উদ্ধার করে পুনরায় আলোচনা চালাতে থাকেন— সমুদ্র মন্থন চলতে শুরু করলো। বিষাক্ত পরিবেশ থেকে উত্তরণের জন্য কূর্মাবতার তখন সমস্ত নেতাকে বলেন, 'আপনারা সকলেই শ্রেষ্ঠ, বাস্তবে দোষ তো আমারই...'। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বিষাক্ত পরিবেশ ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে লাগল। এরপর তিনি বলেন, 'যার যা কিছু নিজস্ব, তাই ভালো'। এই কথায় আত্মনিরীক্ষণের দিকেই দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। এটি স্বাভিমান সৃষ্টির প্রয়াস। মৎস্যাবতারে যে Nation তৈরি হয়েছিল তাকে আরও মজবুত করার কৌশল। দেবতাদের ধারণা ছিল, তাদের সংস্কৃতি অন্যদের চেয়ে উন্নততর। তাই তাদের মনে স্বাভিমান ছিল বেশি। আলোচনা চলতে চলতে অনেকসময় নিরাশার সৃষ্টি হয়েছিল, এমনকী যুদ্ধের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করার দুর্বুদ্ধিও দেখা দিয়েছিল। কিন্তু অধ্যক্ষ কূর্মাবতার অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। সমাজ তাঁর এই প্রচেষ্টার শুভফল দীর্ঘকাল লাভ করেছিল। এক সুস্থির সমাজ সৃষ্টি হয়েছিল, যার ফলস্বরূপ

কিছু লোক অমৃততত্ত্ব লাভ করেছিল যে তত্ত্ব মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করতে প্রভূত সাহায্য করেছিল। মানুষের মনে এই ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, সমাজ এক পুরুষ, আমরা তাঁর অবয়ব, সমাজের কল্যাণেই আমাদের কল্যাণ। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে বহু মানুষ সমাজের উন্নতিতে আত্মনিয়োগ করলো। যার বুদ্ধি ও কৌশলে এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছিল তিনিই কূর্মাবতার বিষ্ণু। তিনিই এমন অমৃত দিশায় মানুষকে উত্তীর্ণ করেছিলেন। তাই আজও মানুষ তাঁকে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করে। অন্তরের শ্রদ্ধা ভালবাসায় ভগবানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। পুরাণকারগণ বলেন, সমুদ্র মন্থনের ফলে কামধেনু (কৃষিভূমি), উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত, কৌস্তুভমণি, ঔষধিপতি চন্দ্র, লক্ষ্মী, অপ্সরা, পারিজাতবৃক্ষ ইত্যাদি বহু সম্পদ উঠেছিল। বস্তুত এগুলি স্থাবর জঙ্গম নানা সম্পদ। কারণ এইসব জিনিস উভয়পক্ষ নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়েছিল। এই কাজের মধ্যে দিয়ে উভয়পক্ষের বন্ধুত্বপূর্ণ মানসিকতার কথাই প্রতিভাত হয়েছে। এই বন্ধুত্বপূর্ণ সমন্বয় দিশা স্পষ্ট হওয়ার পরেও মন্দবুদ্ধি রাক্ষসরা কিন্তু সেই মানসিকতা অনুযায়ী কাজ করতে পারলো না। নিজ নিজ ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ভোগময় প্রবৃত্তিকে সংযত করতে তারা ব্যর্থ হলো। অপরদিকে দেবতারা কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থ সংযত করে সমুদ্র মন্থনের ফলে যে সমন্বয় অমৃত উঠলো তা লাভ করলো। অর্থাৎ দেবতারা বুঝলো, সমন্বয়ের মধ্যে দিয়েই উন্নতি সুখ-সমৃদ্ধি- শান্তি সবকিছুই পাওয়া যায়। তারা সেইভাবে তাদের জীবনচর্যা গড়ে তুলল। পুরাণকারের ভাষায় তারাই অমৃত লাভ করল।

রাক্ষসদের অধিকাংশই স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন হলেও রাহু ও কেতু পারস্পরিক সহযোগিতা অর্থাৎ সমন্বয়ের মূল্য বুঝতে পেরেছিল। এরা তাই যুক্তভাবে দাক্ষিণাত্যে (দক্ষিণাঞ্চলে) নিজেদের আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করে। কিন্তু সৌরমণ্ডল (করমণ্ডল) ও চন্দ্রমণ্ডলের (মালাবার অঞ্চল) মানুষদের সহায়তায় এবং ভেদনীতি প্রয়োগ করে দেবতারা তাদের এই চেষ্টা ব্যর্থ করে দিল। তা সত্ত্বেও ওই অঞ্চলে এই জাতির (রাক্ষস) প্রাধান্য স্বীকার করতেই হয়। পুরাণকারের দৃষ্টিতে বিন্দুমাত্র অমৃতলাভ (পারস্পরিক সহযোগিতার মূল্য) করার জন্যই ধড়হীন রাহু ও মুণ্ডহীন কেতু জীবিত থেকে পর্বকালে চন্দ্র-সূর্যকে গ্রাস করে।

আপন বুদ্ধিমান্দ্যবশত সমুদ্র মন্থনের পর (হৃদয় মন্থনের পর) দেবতাদের তুলনায় পিছিয়ে পড়া রাক্ষসরা শুক্রাচার্যকে গুরু বরণ করে এই পশ্চাদ্‌গামী অবস্থা অনেকটা কাটিয়ে ওঠে। শুক্রাচার্য উত্তরাঞ্চলের লোক। তিনি ব্রাহ্মণ। তিনি বুদ্ধিমান ও রাজনীতি বিশারদ। তিনি সেই সময়ে পরিস্থিতি নিপুণভাবে উপলব্ধি করে রাক্ষসদের উপদেশ দেন, 'ঐক্যবদ্ধ হয়ে চেষ্টা করলে অতীতের চেয়ে বেশি বৈভবময় ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারবে।' এই আত্মবিশ্বাস-ই আশাবাদী শুক্রাচার্যের 'সঞ্জীবনীবিদ্যা'। যা তাঁর একান্ত নিজস্ব আবিষ্কার।

সমুদ্র মন্থন প্রসঙ্গে মন্দর পর্বতের উল্লেখ আছে। এই পর্বত বিহারের ভাগলপুরে অবস্থিত। মনে হয়, এই পর্বতের আশেপাশেই কোথাও এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যার অধ্যক্ষ ছিলেন কূর্মাবতার। এই ধারণার স্বপক্ষে আর একটি যুক্তি হলো এখানে কূর্মীগোষ্ঠীর অস্তিত্ব। এই কূর্মাবতার নামে প্রসিদ্ধ মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়তো এই কূর্মী-কুলেই হয়েছিল। কিংবা কূর্মাবতারের উত্তরপুরুষরা কূর্মী নামে পরিচিত হয়েছিল। এই গোষ্ঠীর লোকেদের বসতি উত্তর ভারতের নানা স্থানে থাকলেও বিহারেই এদের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়।

সমুদ্র মন্থনের বর্ণনা রোমহর্ষক অদ্ভুতরসের বিষয় হলেও এটি মূলত ভারতীয় রাষ্ট্রজীবনের এক মহৎ প্রগতি পুঞ্জের (point) কাব্যময় সত্যকথা। কোনো সমাজ যদি সংহত জীবনযাপনের বাইরে চলে যাওয়ার অবস্থায় পৌঁছায় তবে সেই সমাজে অন্তর্বিবাদ দেখা দিতেই পারে। অধুনা পাশ্চাত্যে এই ধরনের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সকলের হিতের দিকে লক্ষ্য রেখে পারস্পরিক সহযোগিতার ভাব বৃদ্ধি করার মধ্য দিয়েই স্বার্থদ্বন্দ্বের মীমাংসা করার মতো ব্যক্তি পাশ্চাত্যে বিদ্যমান। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে স্বার্থদ্বন্দ্বের মীমাংসা করার মধ্যেই মনুষ্যত্বের পরিচয়। সমুদ্র-মন্থনের কাহিনীর মধ্য দিয়ে ভারতীয়রা যে এই অমৃততত্ত্ব তাদের প্রাচীন সভ্যতা ও জাতীয় জীবনের ঊষাকালেই উপলব্ধি করেছিল তার জন্য কূর্মাবতারের অবদান অনস্বীকার্য। তিনিই উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে সৃষ্ট বিভেদের অপনোদন করার জন্য ভারতীয়দের হৃদয় মন্থন রূপ আলাপ-আলোচনা ও বিচারের ব্যবস্থা করেছিলেন, যা পুরাণকারদের কল্প রচনায় সমুদ্র-মন্থনের রূপ লাভ করেছে। কূর্মাবতারের মূল শিক্ষা হলো পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয়ের মাধ্যমেই সমাজ সুখ-শান্তি বিরাজ করে এবং সমস্ত বিবাদের সমাধান আলোচনার মাধ্যমেই সম্ভব।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী
*নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন*
*মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।*
শান্তিনিকেতন, বোলপুর
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

# রামকৃষ্ণ-জননী চন্দ্রমণি দেবী

রূপশ্রী দত্ত

রামকৃষ্ণ-জননী চন্দ্রমণি দেবী জন্মগ্রহণ করেছিলেন সরাতি- মায়াপুর নামক গ্রামে। সেটি আরামবাগ থেকে পাঁচ মাইল ও কামারপুকুর থেকে চৌদ্দ মাইল পূর্বে অবস্থিত। পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে দ্বারকেশ্বর নদী। সেখানেই ছিল চন্দ্রমণির পিতা নন্দকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্তিকানির্মিত কুটির। দরিদ্র হলেও, জ্ঞানের গভীরতার জন্য, তিনি লোকসমাজে 'পণ্ডিত' নামে পরিচিত ছিলেন। চন্দ্রমণির জননীর নাম ছিল হরবিলাসিনী দেবী। চন্দ্রমণি তাঁদের জ্যেষ্ঠ সন্তান। ১৭৯১ সালে তাঁর জন্ম হয়। চন্দ্রমণির কোনো প্রতিকৃতি-চিত্র পাওয়া যায়নি। তবে লোকশ্রুতি এই যে, তিনি সুন্দরী, দীর্ঘাঙ্গী ও সুগঠিতা ছিলেন। চন্দ্রমণির কনিষ্ঠা ভগ্নী রাইমণি দুর্ভাগ্যক্রমে শৈশবেই দ্বারকেশ্বর নদীতে নিমজ্জিত হয়ে অকালমৃত্যু বরণ করে। চন্দ্রমণির পিতৃকুলে দীর্ঘদিন ব্যাপী আয়ুর্বেদচর্চার খ্যাতি ছিল। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণমোহন ছিলেন বিখ্যাত আয়ুর্বেদ চিকিৎসক।

তৎকালীন গ্রাম্য প্রথা অনুযায়ী মাত্র আট বছর বয়সে ১৭৯৯ খৃস্টাব্দে চন্দ্রমণির বিবাহ হয়। পাত্র ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়— দীর্ঘাঙ্গ, সুপুরুষ, বছর পঁচিশের যুবক। তাঁর বাস ছিল দেবেপুর গ্রামে। তিনি পুরোহিত ছিলেন। তাঁর ছিল পৈতৃক কয়েক একর ধানজমি। 'চাটুয্যেদের পুকুর' নামে পরিচিত পুকুরের পাশেই নববধূ হিসেবে শঙ্খ ও উলুধ্বনির মধ্য দিয়ে চন্দ্রমণিকে বরণ করা হয়।

চন্দ্রমণি গৃহকর্ম দক্ষ হাতে পরিচালনা করতেন। ক্ষুদিরামের বৃদ্ধা জননী, কনিষ্ঠ দুই ভ্রাতা নিধিরাম ও কানাইরাম— এছাড়া ক্ষুদিরামের অসুস্থা ভগ্নী রামশিলা ও তাঁর দুই সন্তানের দায়িত্বও পালন করতে হোত। চন্দ্রার জ্যেষ্ঠ সন্তান রামকুমার (১৮০৫) ও তারপর কন্যা কাত্যায়নী (১৮১০)। মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করায় জমিদার রামানন্দ রায়, ক্ষুদিরামের সমস্ত জমি আত্মসাৎ করে নিলেন। তখন সুখলাল গোস্বামী নামক এক বিশিষ্ট ব্যক্তির আনুকূল্যে ক্ষুদিরাম- চন্দ্রমণি কামারপুকুরে সংসার পাতেন। চন্দ্রার সেখানে তিন অন্তরঙ্গ সঙ্গিনী প্রাপ্তি হয়। ধর্মদাস লাহার স্ত্রী মঙ্গলাবালা, কন্যা প্রসন্নময়ী ও ধনী কামারনী। ১৮৩৬ সালে জন্ম হয় শ্রীরামকৃষ্ণের। এর আগে ক্ষুদিরাম ও চন্দ্রমণির নানা অলৌকিক দেবদেবী দর্শন হয়। রামচন্দ্র, শিব— এমনতর অনেক দেবতা তাঁদের দর্শন দিয়েছিলেন। তাঁদেরই অংশরূপে তাঁদের ভাবী সন্তানের আগমন ঘটছে— যে বিষয় তাঁরা অবগত ছিলেন। যথাকালে জন্ম হয় শ্রীরামকৃষ্ণের। পুত্রকে তিনি 'কেষ্ট' নামে ডাকতেন। যদিও, তাঁর সর্বজনপরিচিত নাম ছিল গদাধর। চন্দ্রমণির এক মাতৃপিতৃহীন ভিক্ষা-পুত্র ছিল। নিদারুণ ম্যালেরিয়া রোগে চন্দ্রমণি অক্লান্ত সেবায় তাঁকে নিরাময় করেন। চন্দ্রমণি ছিলেন সেবাপরায়ণা। পরিচিতজনের অসুখে তাঁর আয়ুর্বেদ চিকিৎসাজ্ঞান কাজে লাগিয়ে, তাদের সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করতেন।

গদাধর কালক্রমে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারের অধীনে ভরতারিণীর মন্দিরে পৌরোহিত্য করতে গেলেন। বালিকা-পত্নী সারদা থাকতেন নহবতে। তখন চন্দ্রমণিও ছিলেন সেখানে। সারদাও শ্বশ্রূমাতা চন্দ্রমণির অক্লান্ত সেবা করতেন। সেখানেই চন্দ্রমণির জীবনান্ত হয়েছিল ১৮৭৭ সালে।

শ্রীরামকৃষ্ণ, জননী চন্দ্রমণি সম্বন্ধে বলেছিলেন, সহজ এক অদ্ভুত সরলতা তাঁর ছিল। পার্থিব প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি বিষয়ে তিনি একান্তই উদাসীন। এই সরলতা ভিন্ন ঈশ্বরলাভ হয় না। রামকৃষ্ণ আরো বলেছিলেন— লৌকিক জননীকে ধ্যান করলেই বিশ্বজননীর সন্ধান পাওয়া যায়। প্রত্যেকেরই উচিত আমৃত্যু জননীর তত্ত্বাবধান করা। রামকৃষ্ণ নিজেও পুষ্পচন্দন সহযোগে মাতৃপূজা করেছেন। রামকৃষ্ণের সমাধি অবস্থা দেখে সরলা চন্দ্রমণি বলেছিলেন— 'ও কেষ্ট, তোর একি অবস্থা হলো। আমার মরার সময় আমাকে কে দেখবে?' রামকৃষ্ণ কিন্তু যাবজ্জীবন ভবতারিণী কালীর মতোই লৌকিক জননীকেও দেখেছেন।

চন্দ্রমণিও যে কোনো অবতার-জননীদের মতোই পূজনীয়। তাঁর ঘটনাবহুল জীবনের আলোচনায় চোখে পড়ে তিনি নেহাৎই এক প্রাকৃত জননী নন, অলৌকিকত্বের মোড়কে আবৃতা, তিনি এক লৌকিক জননী।

জেগে ওঠা অন্যভাবে

# প্রত্যূষ আর এক সাধুবাবা

**কৌশিক গুহ**

বেশ কিছুদিন হলো বিপুলদের বাড়ির কাছে এক সাধু এসেছে। বেশ লম্বা চুলদাড়ি আছে। দেখলে ভক্তি জাগে। সাধুকে রোজ সকালে ঘণ্টা তিনেক দেখা যায়। তারপর সারাদিনে আর দেখা মেলে না। কাছে পিঠে কোথাও হয়তো থাকে। অতশত জানার আগ্রহ বিপুলের নেই। সাধু নদীর ঘাটের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কিংবা বসে একটা কথা টানা বলে যায় : 'যা চাইবে তাই পাবে। যা চাইবে তাই পাবে।' পথচলতি লোকজন শোনে

কথাগুলো। ভাবে সাধুবাবার মাথা বিগড়ে গেছে। একটা কথা একটানা বললে লোকে ওইরকম ভাবতে পারে। বিপুল নদীতে চান করার সময় ব্যাপারটা লক্ষ্য করে। সাধু কারও কাছে কিছু নেয় না। অন্য কোনো কথাও বলে না।

সেদিন প্রত্যূষ যাচ্ছিল নিজের কাজে। সে যুবক। বেশ পরিশ্রমী। দাঁড়িয়ে পড়ল সাধুর কথা শুনে। সামনে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'প্রণাম মহারাজ।' সাধু মাথা নেড়ে প্রণাম নিয়ে একই কথা বলতে লাগল, 'যা চাইবে তা পাবে।' প্রত্যূষ দাঁড়িয়ে রইল সামনে। তারপর বলল, 'মহারাজ একটা প্রশ্ন করবো?' সাধু হেসে বলল, 'করো বেটা।' প্রত্যূষ বলল, 'মহারাজ আপনি যা বলছেন তা কি ঠিক, যা চাইবে তাই পাবে?'

সাধু দৃঢ় বিশ্বাসে বলল, 'হ্যাঁ বাবা, তুমি একমনে যা চাইবে তা পাবে! তুমি যদি চাও আমি দিতে পারি। তার আগে বলো তোমার দুঃখ কষ্ট কি? কি না পাওয়ার জন্যে তোমার মনের মধ্যে সব অশান্তি?'

প্রত্যূষ ভাবল এই সাধুর কথা অন্যরকম। মনের কথা সকলকে তো বলা যায় না। এঁকে বলা যেতে পারে। প্রত্যূষ হাত জড়ো করে বলল, 'মহরাজ আমার কষ্ট দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। এক হীরে ব্যবসায়ীর কাছে কাজ করি অনেক বছর ধরে। কাজের জন্যে বাড়তি টাকা পাই না। তারিফও নয়। লোকটা যতটা পারে কম পয়সা দিয়ে যত বেশি সম্ভব খাটায়। ব্যবহারও খুব খারাপ। ওইরকম একটা লোকের কাছে কাজ করতে মন চায় না। কিন্তু কি করবো!' সাধু তার দিকে তাকিয়ে থাকলো কিছুক্ষণ। তারপর বললে, 'কি চাও তুমি?' প্রত্যূষ বলল, 'আমি যেন একজন হীরে ব্যবসায়ী হতে পারি।' সাধু বলল, 'হবে।' একটু থেমে সাধু বলল, 'তোমাকে দুটো অমূল্য রত্ন আমি দিচ্ছি। দুটো নিয়ে তোমার পকেটে ভালো করে রাখবে।' সাধু তাকাল প্রত্যূষের দিকে। বলল, 'বাড়াও ডান হাত। দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুঠো করে পকেটে ভরো।' প্রত্যূষ তাই করল। সাধু বলল, 'তোমাকে যে মহামূল্য রত্ন দিলাম তার নাম সময়। এবার বাড়াও বাঁ হাত।' প্রত্যূষ বাঁ হাত মেলতে সাধু বলল, 'যা দিচ্ছি তা মুঠোয় বন্ধ করে পকেটে যত্নে রাখো।' প্রত্যূষ তাই করল। সাধু বলল, 'তোমাকে দিলাম আরেকটি অমূল্য রত্ন। এর নাম ধৈর্য। দেখবে এই রত্ন দিনে দিনে বাড়ছে আগেরটার মতো।'

প্রত্যূষ মনের মধ্যে অন্যরকম জোর পেলো। সে কাজ করতে লাগল আরো মন দিয়ে। বছর ঘোরার মুখে তার সুযোগ এলো এক দোকানের পূর্ণ দায়িত্ব নেওয়ার। কয়েক বছরের মধ্যে সে মালিক হলো। তার প্রতিষ্ঠানের নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। দিনে দিনে টাকা বাড়তে লাগল। একসময় যার দোকানে কাজ করত অনেকরকম লাঞ্ছনা সহ্য করে সেই মালিক কোথাও ভালো কারিগর না পেয়ে ব্যবসা উঠিয়ে দেওয়ার কথা ভাবল। প্রত্যূষ তাকে বলল, 'তুমি ব্যবহার ভালো করো। আর লোকের পরিশ্রমকে মর্যাদা দাও। যারা কাজ করে তারা তোমার চাকর-বাকর নয়— এটা বোঝার চেষ্টা করো। নিজেকে শোধরাতে পারলে দেখবে তোমার ব্যবসা আবার চলছে ঠিকভাবে।'

প্রত্যূষ বড় ব্যবসায়ী হয়ে যাওয়ার পর পুরনো দিনের কথা একটুও ভোলেনি। সকলের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা তার স্বভাবের মধ্যে রয়েছে। যত্ন নিয়ে ভালো কাজ করে সবসময়। তার কাছে যারা কাজ করে তাদের সুবিধে-অসুবিধের দিকে লক্ষ্য রাখে। প্রতিদিনই মনে পড়ে সাধুবাবার কথা। যিনি তার মতো হতাশায় ভোগা মানুষকে অন্যভাবে জাগিয়ে দিয়েছিলেন। প্রত্যূষ তার ব্যবসার জায়গায় দুটো মণি রেখে দিয়েছে অত্যন্ত যত্নে। একটার নাম সময়, অন্যটার নাম ধৈর্য। প্রত্যূষ সেই দিনটার কথা ভাবে। নদীর ধারে দাঁড়িয়ে সাধুবাবা শুধু বলছে 'যা চাইবে তাই পাবে। তাই পাবে যা চাইবে।' প্রত্যূষ মনে মনে প্রণাম করে তাঁকে।

*(একটি হিন্দি লোককাহিনী অনুসরণে)*

*ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত*

## বই কথা কই

# বইয়ের টানে জড়ো হওয়া

সমমিতাকে মা অনেক বইপত্র কিনে দেয়। কয়েকটা পত্রিকাও। আগে পড়তে পারত না। শুধু ছবি দেখত। নিজের মনে কত কিছু ভাবত। বাবা ওকে রঙ কাগজ দিয়ে বলত, 'যা খুশি আঁকো।' তখনও পড়তে কিংবা লিখতে শেখেনি। আঁকার মধ্যে মজা ছিল। বাবা সেগুলো জমিয়ে রাখত। একটা কৌটোতে রঙিন প্যাস্টেল থাকত। ছড়িয়ে রঙ করত। আবার গুছিয়ে তুলে রাখত। মা দুটো পুরনো বড় ডায়েরি দিয়েছিল যা খুশি আঁকার জন্যে। আঁকা তো মজার ব্যাপার। রঙ দিয়ে আঁচড় কাটা। কত কি এঁকে ফেলত আপনমনে। বাবা বলত, 'সুন্দর হয়েছে।' শুধু দাদা বলত মাকে ডেকে, 'মা দ্যাখো, বোন কিসব আবোল তাবোল আঁকছে।' মা বলে, 'আঁকুক। তুইও ওইরকম আঁকতিস। বোনের পাশে বসে তুইও আঁক না। বোনের ভালো লাগবে।' ঠাকুমা ওদের ছবি আঁকা দেখে মজা পেত। মাঝে মাঝেই দাদাই রঙ এনে দিত নাতি নাতনিকে।

এখন সমমিতা পড়তে ভালোবাসে। একা একা বই পড়ে মজা পায়। ঠাকুমা মাঝে মাঝে নাতনিকে বলে, 'দিদিভাই মন দিয়ে যে বইটা পড়ছো সেটা নিশ্চয়ই তোমর খুব পছন্দের। বইটা থেকে আমাকে একটু পড়ে শোনাবে না?' সঙ্গে সঙ্গে রাজি। দাদাই আর ঠাকুমা তো তার বন্ধু। দাদারও। তার সব কথা মন দিয়ে শোনে ওই দুজন। কখনও কখনও শাসনও করে। আগে ঠাকুমার কোলে কে বসবে তা নিয়ে দাদার সঙ্গে ঝগড়া হোত। এখন দাদা আর বসে না। সমমিতা ভালোবাসে ঠাকুমার কোলে বসে গল্প শুনতে। কত গল্প শুনেছে। একই গল্প অনেকবার শুনে নতুন মনে হয়েছে। বাবা মাঝে মাঝে বই এনে দেয় ঠাকুমাকে। চটপট পড়ার অভ্যেস ঠাকুমার। দাদাই খবরের কাগজ আর দু-একটা পত্রিকা ছাড়া কিছু পড়ে না। বই পড়ে ঠাকুমা। বাবা বলে, 'মা বরাবরই প্রচুর পড়ে। ছেলেবেলায় দেখতাম মা রান্না করতে করতে পড়ত। বাবা বই এনে দিত। অনেক বই কেনা হোত। লাইব্রেরি থেকেও বই আসত। মা বই উপহার দিত অনেককে। এখনও দেয়। মা সকলের জন্মদিনে বই দেয় প্রতি বছর। আর স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ার সময় থেকে মায়ের জন্মদিনে আমি বই দিই।'

সমমিতা দেখেছে তার বাবা খুব ভালোবাসে ঠাকুমা আর দাদাইকে। ঠাকুমা কত যত্নে বড়ো করছে ছেলে আর মেয়েকে। মেয়ে মানে সমমিতার পিসি। মাঝে মাঝে আসে। খুব ভালোবাসে ভাইঝিকে। পিসির সঙ্গে দাদাভাই আসে। তিন নাতি নাতনিকে একসঙ্গে পেয়ে খুব আনন্দ হয় ঠাকুমার। দাদাইয়েরও। ঠাকুমা তিনজনকে একটা করে বই দেয়। দাদাভাই রবীন্দ্রনাথের গান খুব ভালো গায়। ঠাকুমা গান শোনাতে বলে। সমমিতাও এখন গান শিখছে। মাঝে মাঝে ঠাকুমা শুনতে চায়। ওর মা আর পিসিও ভালো গায়। একেক সময় বাড়িতে বেশ ভালো গানের আসর বসে। সমমিতা তার দাদাইকে বলে, 'তুমি একটা গান গাও।' নাতনির কথা তো এড়ানো যায় না। অতুলপ্রসাদ সেনের একটা গান শুরু করে। মন দিয়ে শোনে সবাই। ঠাকুমাও গায়। ওর দুষ্টু দাদাটাও একটা গান শোনায়, 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে।' সেই গানে গলা মেলায় সমমিতা, দাদাভাই, ঠাকুমাও। পিসি আর মা-ও যোগ দেয়।'

**বইমিত্র**

## গাছ কাটা এবং তারপর..

# মুসলমান মেয়েদেরও স্বপ্ন বদল হচ্ছে

**সালমা খাতুন**

মুসলমান সমাজের মেয়েদের সবচেয়ে বেশি বঞ্চনা, অবহেলা ও হিংসার শিকার হতে হয়। মোল্লা-মৌলবি শাসিত আমাদের এই সমাজের মেয়েদের লুকিয়ে কাঁদতে হয়। প্রতি পদে মেয়েদের আইনের বেড়াজালে বেঁধে রাখা হয়। মোল্লা-মৌলবিরা মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮ বছরের কম করার জন্য আদালতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উদারমনা মুসলমানরা যদিও এর পক্ষে নেই। কেরলের

*ফারদিনা আদিল*

কট্টরপন্থী মুসলমানরা মেয়েদের বিয়ে ১৮ বছরের কম হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাল্যবিবাহ আটকানোর জন্য ২০০৬ সালের বিবাহ সম্পর্কিত আইনে বলা হয়েছে যে-কোনো ধর্ম বা সম্প্রদায়ের মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮ বছর হতে হবে। কিন্তু মুসলমান সংগঠনগুলি একে মুসলমানদের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপের দোহাই দিয়ে কতশত মেয়েদের বাল্যকালেই বিয়ে দিয়ে তাদের পড়াশুনা বা অন্য অধিকারগুলি হরণ করছে।

কাশ্মীরের মেয়েদের পারিবারিক ভেদভাবের শিকারের কথা কেউ খুব একটা জানে না। কোনো কাশ্মীরি যুবতী কাশ্মীরের বাইরের যুবককে বিয়ে করলে পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। কিন্তু কাশ্মীরে বধূ হয়ে এলে আবার সমস্ত অধিকার পাওয়া যায়। প্যান্থার্স পার্টির সভাপতি প্রফেসর ভীম সিংহ কিছুদিন আগে সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলা দায়ের করেছেন। তাতে তিনি দাবি করেছেন বাইরে বিয়ে হওয়া কাশ্মীরি কন্যাদের পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার দিতে হবে। কিন্তু ওই রাজ্য সরকার এখন পর্যন্ত পরিষ্কারভাবে কিছু জানায়নি। কাশ্মীরে মেয়েদের অধিকার অনেক বছর থেকেই নেই। মোল্লা-মৌলবিরা মেয়েদের স্বাধীনতাকে গুণাহ মনে করে। কিন্তু

অঙ্গনা

এখন ধীরে ধীরে সচেতনতা বাড়ছে। লোকেরা মেয়েদের পড়াশুনা করার অধিকার দিতে শুরু করেছে। আনন্দের কথা— কাশ্মীরি কন্যা আয়েশা আজিজ বিমান চালক হওয়ার জন্য মুম্বায়ের ফ্লাইং ক্লাবে ট্রেনিংরত আছে।

কিছুদিন আগে অসমের গুয়াহাটির ফরদিনা আদিল রেকর্ড নম্বরে আই এ এস পাশ করেছে। ফরদিনা অসমের প্রথম উচ্চ শিক্ষিতা মেয়ে। এরকমই পাটনা ইউনিভার্সিটির স্কলার জিশান আলি আমেরিকায় ফুল ব্রাইট ফেলোশিপ পেয়েছে। দুই বছর আগে একটি সামাজিক সংস্থা মুসলমান মেয়েদের আশা-আকাঙ্ক্ষা জানার জন্য একটি সমীক্ষা করেছে। এই সমীক্ষায় দেশের বিভিন্ন গ্রামে ও শহরে প্রায় চার হাজার মেয়ের সঙ্গে কথা বলে। এতে দেখা যায়, দরিদ্র পরিবারের মেয়েরাও বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। তাদের মধ্যে কেউ সানিয়া মির্জা, কেউ সাবানা আজমি হওয়ার মতো স্বপ্নও দেখছে। বেশিরভাগই শিক্ষিকা থেকে বৈজ্ঞানিক, কমপিউটার ইঞ্জিনিয়ার, লেখক ও চিত্রশিল্পী হতে ইচ্ছা রাখে।

'ভারতীয় মুসলিম মহিলা আন্দোলন'-এর সদস্যা জাকিয়া সোমন বলেন— মুসলমান সমাজের মেয়েরা লেখাপড়া শিখে শিক্ষিতা হলে সমাজে পরিবর্তন আসবে। মুসলমান সমাজের মেয়েদের মাদ্রাসা শিক্ষা থেকে বেরিয়ে অন্য সমাজের মেয়েদের মতো আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা হতে হবে।

মনে প্রশ্ন জাগে, গণতান্ত্রিক দেশ ভারতে আলাদা আলাদা আইন কেন? কোথায় মানবাধিকারবাদীরা যাঁরা মুসলমান মেয়েদের ন্যায্য পাওনা দিতে পারেন? শুধু তাই নয়, গান গাইলে, নাচলে কেন মুসলমান মেয়েদের গুলি খেয়ে মরতে হয়?

*আয়েশা আজিজ*

মুসলমান মেয়েদের সামনে মালালা ইউসুফজাই আদর্শ হিসাবে থাকা উচিত। সে ১১ জন মেয়েকে পড়াশুনায় উৎসাহ দেওয়ার জন্য তালিবানদের গুলি খেয়ে মরতে মরতে বেঁচে গেছে। তবু সে পড়াশুনা ছাড়েনি। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি তাকে সম্মানিত করেছে। হার্ভার্ড তাকে ২০১৩ সালে পিটার জে গোমস্ পুরস্কারে ভূষিত করেছে। ১৬ বর্ষীয়া মালালা রাজনীতিক হতে চায়। কেননা সত্যিকারের রাজনৈতিক নেতা সমাজকে প্রভাবিত করে দেশের সেবা করতে পারে।

আমার বিশ্বাস, নতুন সরকার মুসলমান সমাজের মেয়েরা বাকি মেয়েদের মতো আধুনিক শিক্ষা ও সর্বপ্রকারের মর্যাদা পাবে। গুজরাটের মুসলমান মেয়েরা অন্য রাজ্যের তুলনায় সবদিক থেকে এগিয়ে চলেছে। অর্থাৎ মুসলমান মেয়েরাও স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। মোল্লা-মৌলবিদের চোখ রাঙানির দিন শেষ হতে চলেছে।

# অভিযোগপত্র আর নয়

অতিথি কলম

তভলীন সিং

এই গত সপ্তাহেই দেশের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী মহামহিম চিদাম্বরম এমন আড়ম্বরের সঙ্গে তাঁর জমানার ভুলগুলির ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন তাতে চট করে বিভ্রম হতে পারে যে তিনি হয়ত আদতে নিজের গুণকীর্তন করছেন। তাঁর ভাষণটি এক বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক লিখিত একটি বই প্রকাশ অনুষ্ঠান উপলক্ষে দেওয়া। সেখানে উপস্থিত প্রিন্ট ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সাংবাদিককুল তাঁকে এই প্রসঙ্গে চেপে ধরে। সাংবাদিকরা সটান তাঁকে তাঁর বাগাড়ম্বরের স্বপক্ষে যুক্তি খাড়া করার দাবি জানায়। চিদাম্বরম সাহেব খুব ভারিক্কিভাবে জানান আসলে তাঁর দলের নেতারা (তিনি কি বাদ?) বুঝতেই পারেননি যে ভারতীয় ভোটারদের ভাব-ভাবনায় কি আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। দেশ এগিয়ে গেছে বহু দূর। আদতে বরাবরের অভিযোগ-অনুযোগ জানানোর সমাজ থেকে দেশে এখন গড়ে উঠেছে এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী সমাজ। আজ তাই মানুষকে করুণা প্রার্থনার পঙতিতে বসানো বড়ই শক্ত। গরিবস্য গরিবও আজ তুলনামূলকভাবে উন্নত জীবনশৈলীর প্রত্যাশী। কোনো অবস্থাতেই তারা আর নিজেদের দুরবস্থার জন্য কপালকে দায়ী করতে রাজি নয়। আরে, এ কথাটা চিদাম্বরম সাহেবের বুঝতে এত দেরি হল! নরেন্দ্র মোদী তো ব্যাপারটা কবেই ধরে ফেলেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন গুজরাটের গ্রামীণ অঞ্চলের মানুষজনের মধ্যে শহুরে হয়ে ওঠবার, সেখানকার সুযোগ-সুবিধাগুলি পাওয়ার কি প্রবল আকুতি। মধ্যশ্রেণীতে পৌঁছে যেতে সবাই বদ্ধপরিকর। এর মধ্যে অন্যায় তো কিছু নেই। উন্নত জীবন প্রণালী তো সকলেরই আরাধ্য। মোদী তাঁর সাম্প্রতিক নির্বাচনী সভাগুলিতে একটা গল্প প্রায়ই বলতেন। তিনি প্রথমবার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে পরেই গুজরাটের কোনো একটি গ্রাম থেকে একদল কৃষক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এল। তাদের দাবি তারা যেন রাতের খাবারটা বৈদ্যুতিক আলোর নীচে বসে শান্তিতে খেতে পারে। এই একটা দাবিই তাঁর ভাবনার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। যেভাবেই হোক গ্রামে গ্রামে ২৪ ঘণ্টার বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে তিনি সফলভাবে লেগে পড়েন। পরের গল্পটি আরও চমকপ্রদ— এক জনজাতি কলাচাষি তাঁকে জানিয়েছিল সুদূর মেক্সিকোতে রপ্তানিযোগ্য তার কলাগুলি গুজরাটের ভাঙাচোরা রাস্তায় যেতে যেতেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। মোদী তাঁর মতো করেই দ্রুত ব্যবস্থা নেন।

**অর্থমন্ত্রী চিদাম্বরম**

এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় সোনিয়া মনমোহন সরকারের মন্ত্রীদের মধ্যে চিদাম্বরম নিশ্চিতভাবেই দ্রুত অর্থনৈতিক সংস্কারের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু হায়! তাঁর প্রভু সোনিয়া ভিক্ষের রাজনীতি বলুন আর অর্থনীতিই বলুন তাতেই বেশি আস্থা রাখতেন। আর সমালোচনা বা অন্য মতামত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তিনি উত্তর কোরিয় মডেলই অনুসরণ করতেন অর্থাৎ সমালোচককেই হটিয়ে দাও। কেউই তাঁকে বলতে ভরসা পেত না যে তিনি কোনো সম্পদ সৃষ্টি ছাড়াই জাতীয় কোষাগার থেকে হাজার হাজার কোটি টাকার খয়রাতি সাহায্য দিয়ে চলেছেন। দেশের কোষাগার শূন্য হয়ে যাচ্ছে। টাকা রাস্তায় হাপিশ হয়ে যাচ্ছে। কেউ তাকে বুক ঠুকে বলতে পারেনি মহাত্মা গান্ধী গ্রামীণ রোজগার যোজনা (MNREGA)-র ১০০ দিনের কাজ পেয়ে কেউই নিজেকে পাকাপাকিভাবে দারিদ্র্যসীমার ঊর্ধ্বে ওঠাতে পারবে না। যেমন কেউই তাকে বোঝাতে যায়নি লক্ষ লক্ষ অপুষ্টিতে ভোগা শিশু তাঁর বিপুল খরচাসাপেক্ষ কিন্তু নিষ্ফলা খাদ্য নিরাপত্তা আইনের বিন্দুমাত্র সুবিধেও পায়নি। হায়! অথচ এই দুটি বস্তুকেই স্নো-পাউডার মাখিয়ে তিনি ও তাঁর পুত্র তুমুলভাবে দেশবাসীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়ে পালে হাওয়া টানতে চেয়েছিলেন। সাধারণ ভোটদাতারা এতে কর্ণপাত করেনি। এই সব ডোল দেওয়ার কাজে চিদাম্বরম কিন্তু মুখ খোলেননি। এখন বিজ্ঞের মতো বিশ্লেষণ করছেন।

**ক্ষয়িষ্ণু আপ ও মিথ্যাচারী রাহুল**

যাঁরা এই নির্বাচনের সময়ে ভারতের নানান প্রান্তে ঘুরেছেন তাঁরা নিশ্চয় নজর করেছেন যে আম আদমি পার্টি রাজনৈতিক পরিসর থেকে কেমন ভ্যানিস হয়ে গেল। আমি তো দেখেছিলাম প্রত্যন্ত বিহারের নিদারুণ দারিদ্রের মধ্যে থাকা ইঁদুর ধরিয়ে (Musahar) সম্প্রদায়ের মধ্যে এঁদের কিছুটা প্রভাব আছে তবুও এখন ভয়াবহ অবস্থার মধ্যেও তারা দান-খয়রাতি নিতে মোটেই ব্যগ্র ছিল না, পরিবর্তে চাইছিল দীর্ঘস্থায়ী অবস্থার পরিবর্তন। হ্যাঁ, তারাও দয়া প্রার্থী নয়। এই সব খবরাখবরও যথারীতি কেউই রাহুল গান্ধীকে দেয়নি। তাই তিনি একঘেয়ে বলে যেতে লাগলেন মোদী কেবলমাত্র গুটিকয়েক বড়লোককে আরও বড়লোক করতে চান আর কংগ্রেস শুধু গরিবকেই বরাবর সাহায্য দিয়ে যেতে চায়। এই অভিমুখটাতেই মোক্ষম ভুল হয়ে গেছে। এর চেয়েও মারাত্মক অভিযোগ রাহুল গান্ধী জেনে বুঝে করেছেন তা হলো মোদী আদানি গ্রুপকে জলের দরে কৃষিজমি বিলিয়ে দিয়েছেন। আদানি প্রতিষ্ঠানের গৌতম আদানি প্রেস কনফারেন্স করে বলেছেন, তিনি বন্দর নির্মাণের জন্য তৎকালীন গুজরাটের কংগ্রেস সরকারের কাছ থেকে পতিত জমি কিনেছিলেন সেই ৯০ এর দশকে। কিন্তু ভবি ভোলবার নয়, সেই ঘ্যান ঘ্যান তিনি করেই গেলেন। তাঁর কি জানা

উচিত ছিল না জনস্বার্থের খাতিরে বন্দর বা বিমান বন্দর তৈরির মতো ক্ষেত্রে নীতিগতভাবেই সব সরকার কিছুটা কনসেশন দিয়েই সংশ্লিষ্ট পক্ষকে জমি দেয় যাতে তারা জনস্বার্থবাহী কাজে উৎসাহ পায়।

**অপ্রতিরোধ্য মোদী ও প্রিয়াঙ্কা**

এই সব কৃৎকৌশলগুলির কোনটিই মোদীর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার পারদকে দমাতে পারল না। তা সকলের সঙ্গে মা-ছেলেরও নজরে পড়ায় তাঁদের ব্যক্তিগত অধিকারবোধ ও পারিবারিক অবদানের প্রাচীন কাহিনীসমূহ বাজারে নামাতে থাকেন। যদি বোকা-বুদ্ধু ভোটারদের কোনোভাবে বাগে আনা যায়। খুব বুদ্ধি করে এটা করার চেষ্টা করেছিলেন প্রিয়াঙ্কা বঢ়রা গান্ধী। শহীদের মেয়ে বলে কপট রাগ দেখিয়ে হাওয়া গরম করার কোনো সুযোগ ছাড়েননি। ফিল্মস্টারের ভঙ্গিতে সদা হাস্যময় মুখ টিভি ক্যামেরাওলাদের সুবিধের জন্য ধরে রেখেছিলেন। তারাও ভাল ছবি, গোরা রঙ দেখে সেই 'এক্কা গাড়ি খুব ছুটেছে ওই দেখনা ভাই চাঁদ উঠেছে'র মতো পড়ি কি মরি হয়ে ধাওয়া করেছে। চূড়ান্ত চাটুকারিতায় তাঁর প্রত্যেকটি হাঁটাচলাকে প্রয়াত ঠাকুমা ইন্দিরা গান্ধীর বাক্সে ভরে দেবার চেষ্টায় কোনো কসুর করেনি। দশ বছরের ভাঁড়ারে জাল দেওয়া রাজনৈতিক পণ্ডিতের তো অভাব কংগ্রেস রাখেনি। এদের মধ্যে অনেকেই ধুয়ো তুলে দিল হায়রে— যদি প্রিয়াঙ্কাকে সারা ভারতে প্রচারের সুযোগ দেওয়া হোত সেক্ষেত্রে তিনি অবলীলায় মোদীকে হারিয়ে দিতেন। বলে রাখা ভাল, এঁরা হচ্ছে সেইসব পণ্ডিতের দল যারা তাঁদের দিল্লী বা মুম্বাই-এর বাতানুকূল অফিসগুলিতে বসে এইসব ভারী ভারী ফতোয়া দেন। আম জনতার সঙ্গে এঁদের যোগাযোগ বলতে শুধুই গাড়ির ড্রাইভার বা যারা দু'বেলা বাড়িতে খাবার দাবার দেন সেইসব বাবুর্চি আর্দালি শ্রেণী পর্যন্তই। তাও সেখানে খোলাখুলি আলোচনার কোনো অবকাশ নেই, তাই এঁরা ঘুণাক্ষরে টেরও পাননি--- যে আবেগ আসলে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ক্ষেত্রে বহু বছর আগে মানুষের মন ছুঁয়েছিল, হয়ত বেঁচে থাকলে তাঁর ক্ষেত্রেও আজ কাজ দিত না, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী তো দূর অস্তু। হ্যাঁ, আমি নিজে কানে শুনেছি লোকে বলত আমি ইন্দিরাকে ভোট দেব কেননা তাঁর মুখশ্রী আমার ভাল লাগে। মনে রাখবেন সময়, পরিস্থিতি ও বয়সের ব্যাপারগুলো।

**আজকের দিন**

এমন কিছু এই ধরনের আলটপকা ধারণার বশবর্তী হয়ে চলা লোক আজ আর বিশেষ দেখা যাবে না। যার কাছেই যাবেন শুনবেন ভাল রাস্তা, পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ, পরিশুদ্ধ জল, সুন্দর বাসস্থানের মতো মানুষের অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তুগুলিকে পাওয়ার জন্য তাঁরা উন্নয়ন চান। চান বর্তমান অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্থিতির পরিবর্তন।

তাই বলছিলাম, চিদাম্বরম পরিশেষে বুঝেছেন মানুষ আর প্রার্থনাপত্র নিয়ে সাক্ষাৎপ্রার্থী নন। তাঁরা বিকল্প অর্থনৈতিক ভুবনের তীব্র অভিলাষী।


ভ্রমণ পিপাসু বাঙালীর নির্ভরযোগ্য সঙ্গী

Sharada Travels

শারদা ট্রাভেলস্

Member of: TAAB Travel Agents Association of Bengal

ফুলেশ্বর, উলুবেড়িয়া, হাওড়া

প্রত্যুষ মণ্ডল — 9874398337

| ভ্রমণ | মূখ্য দর্শনীয় স্থান | দিন | শুভযাত্রা | প্যাকেজ মূল্য |
|---|---|---|---|---|
| পুরী | ভুবনেশ্বর, নন্দনকানন, ধবলগিরি, খন্ডগিরি, লিঙ্গরাজ মন্দির, কোনারক | ৬ | ১লা সেপ্টেম্বর ২০১৪ | ৩৮০০/- |
| হরিদ্বার | হরিদ্বার, হৃষিকেশ, লক্ষ্মণঝোলা, দেরাদুন, মুসৌরী | ৮ | ৮ই সেপ্টেম্বর ২০১৪ | ৫৮০০/- |

ট্রেনের টিকিট নিশ্চিত করতে অবশ্যই যাত্রা শুরুর ৭০দিন আগে বুকিং করুন

প্যাকেজে থাকছে :- ট্রেনে (স্লিপার ক্লাস) লাক্সারী বাস/ছোট গাড়ীতে যাতায়াত, সাইড সিইং, সকালে চা টিফিন, লাঞ্চ, ডিনার (আমিষ/নিরামিষ), টোল ট্যাক্স, গাড়ী পার্কিং, ফ্যামেলি অনুযায়ী রুম।

প্যাকেজে থাকছে না :- ট্রেন চলাকালীন কোন রকম খাবার, এন্ট্রি ফি, কুলী ভাড়া, ক্যামেরা চার্জ, নৌকাবিহার, রোপওয়ে, হাতি/ঘোড়া চাপা, পূজো দেওয়া, ব্যক্তিগত ব্যবহারের গাড়ী ভাড়া।

# হিন্দুত্বই সাম্প্রদায়িকতা-বিনাশকারী এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার মহৌষধ

**ড. গোপেশ চন্দ্র সরকার**

২০০০ সাল। নতুন সহস্রাব্দ শুরু হয়েছে। এই উপলক্ষে ২০০০ সালের আগস্ট মাসে রাষ্ট্রসঙ্ঘের তৎকালীন মহাসচিব কোফি আন্নান সাহেবের আন্তরিক আগ্রহে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধিবেশন কক্ষে, এক অতি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলন— 'Millenium Religious Peace Summit' বা 'সহস্রাব্দীয় শীর্ষ ধর্মীয় শান্তি সম্মেলন' শুরু হয়েছে। আলোচ্য বিষয় : 'ধর্মীয় প্রচেষ্টায় কিভাবে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে'। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান, মুসলমান প্রভৃতি প্রধান প্রধান ধর্মের ধর্মাচার্যগণকে আহ্বান জানানো হয়েছে এবং ২০০০ সালের এই বিশেষ অধিবেশনে ঠিক ২০০০ জন আমন্ত্রিত প্রতিনিধিই এতে যোগদান করেছেন। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ধর্মীয় মতবাদ কিভাবে সাহায্য করতে পারে, এই বিষয় কোফি আন্নান সাহেব উপস্থিত ধর্মীয় প্রতিনিধিবৃন্দের কাছে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত জানাতে অনুরোধ করেন। একে একে বিভিন্ন ধর্মের মুখ্য প্রবক্তাগণকে বক্তৃতা মঞ্চে আহ্বান জানানো হয়। ইসলাম ধর্মাচার্যগণ বলেন— বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে পৃথিবীর সকলকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হবে, তাহলেই ধর্মীয় ঐক্যের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। একইভাবে খৃস্টান ধর্মগুরুরাও ঠিক একই কথা বললেন— সকলেই যদি খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন তবেই পৃথিবী ধর্মীয় বিদ্বেষমুক্ত হবে এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। সব শেষে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাচার্যগণ বললেন—শুধু ধর্মান্তরণ করলেই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে— এ কথা আমরা বিশ্বাস করি না। ধর্মান্তরণ নয়, প্রয়োজন মানুষকে 'মানসিক-দূষণ' মুক্ত করা, আর এজন্য চাই উদার বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ এবং নৈতিক মূল্যবোধ নির্মাণের উপযুক্ত আধ্যাত্মিক তত্ত্বের শিক্ষা (Spiritual education)। এই শিক্ষাতেই ধর্মীয় গোঁড়ামির উর্ধ্বে উঠে, মানুষ মানুষকে ভালবাসতে শিখবে— প্রতিষ্ঠিত হবে বিশ্বপ্রেম, বিশ্বমানবতার সংস্কৃতি। তখন অবশ্যই আসবে বিশ্বশান্তি।

সম্মেলনের সমাপ্তি ভাষণে হিন্দু ধর্মাচার্যগণের উদ্দেশে প্রজ্ঞাবান মহাসচিব কোফি আন্নান সাহেব বলেন, ''হিন্দুধর্মে সর্বজনহিতকারী কিছু উচ্চ-তত্ত্ব আছে। হিন্দুরা এই সকল তত্ত্ব নিজেদের মধ্যেই সীমিত রেখেছেন। আমি চাই, ধর্ম পরিবর্তন না করে, বিশ্বের অহিন্দু সমাজের প্রায় পাঁচ কোটি মানুষকে আপনারা এই উচ্চ-মূল্যবোধ নির্মাণের তাত্ত্বিক শিক্ষা প্রদান করুন, যাতে তাঁরা সেই আদর্শ অনুসারে জীবনযাপন করতে পারেন। এর ফলে তা যেমন বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার সহায়ক হবে, তেমনি সর্বজন হিতকারী পরাবিদ্যার জ্ঞান লাভেও তাঁরা সমর্থ হবেন।'' ('হিন্দু প্রতিভাকে দর্শন' : পৃ. ১৭৪)

যথার্থই বলেছেন কোফি আন্নান সাহেব। সত্যিই হিন্দুর আধ্যাত্মিক দর্শনের মধ্যেই রয়েছে— বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বমানবতা নির্মাণের শ্রেষ্ঠ মনস্তাত্ত্বিক উপাদান। এদেশেই অধ্যাত্মবিজ্ঞানীর ঋষি-কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী সনাতন মহাবাণী— 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' অর্থাৎ অনলে, অনিলে, সাগরে, সলিলে, অনুতে, পরমাণুতে, সর্বত্রই ব্রহ্ম বিরাজিত। আধুনিক কোয়ান্টাম্ ফিজিক্স একেই বোধহয় বলতে চেয়েছে— 'Unified Field', এ দেশেই ঋষি প্রজ্ঞায় উদ্ভাসিত হয়েছে আর একটি শাশ্বত মহাবাণী— 'শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা :...'। এই দেশই ঘোষণা করেছে— মানুষ কখনোই 'কাফের' নয় বা 'জন্মলগ্ন থেকেই কেউ পাপীও' নয়। মানুষের প্রকৃত পরিচয় 'সে অমৃতের পুত্র, ঈশ্বরের মূর্ত বিগ্রহ'। আধ্যাত্মিক জগতে এ এক বিস্ময়কর আবিষ্কার। মনে রাখতে হবে এসব মহাবাণী সেই দেশে স্বীকৃতি লাভ করেছে যে দেশের স্মৃতিশাস্ত্র উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছে, 'যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্মহানিঃ প্রজায়তে।' অর্থাৎ অযৌক্তিক বিচারে ধর্মহানি হয়।

এটা সেই দেশ, যে দেশের মানুষকে বিচারহীন ভাবে কোনো বাণী বা তত্ত্বকে বিশ্বাস করাবার জন্য কখনো প্রলোভন, চাপ বা বল প্রয়োগ করা হয় না। সুতরাং এদেশে ঋষি-মহর্ষিদের সাধনলব্ধ প্রজ্ঞা (পরম্পরাগত ভাবে আমরা যার উত্তরাধিকারী) কখনোই মিথ্যা হতে পারে না। আর কোনো মিথ্যা তত্ত্ব কখনোই কালজয়ী হতে পারে না। শুধু তাই নয়, সুদূর বৈদিককাল হতে আজ পর্যন্ত সাধন জগতের গভীরে যাঁরাই পৌঁছেছেন, সাধনাই যাঁরাই সিদ্ধিলাভ করেছেন, তাঁরা কেউই বলেননি ভারতীয় যোগশাস্ত্রের এই মহা উদ্‌ঘোষগুলি মিথ্যা বা ভিত্তিহীন। বলেননি শ্রীরামকৃষ্ণ, বলেননি যুক্তিবাদী বিবেকানন্দ অথবা অগ্নিযুগের রাষ্ট্রসাধক ও মহাযোগী ঋষি অরবিন্দও। হিন্দুশাস্ত্রের উদ্দেশ্য— উপযুক্ত অনুশীলনের মাধ্যমে, ধীরে ধীরে মানুষের অন্তর্নিহিত পশুত্ব নাশ করে মনুষ্যত্ব, মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্ব এবং অবশেষে দেবত্ব থেকে তাঁর ব্রহ্মত্বের বিকাশ সাধন। জন্মলগ্নে মানুষ শুধু 'মানুষ' নামক একটি প্রাণী হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করে। সংস্কার সাধন না হলে সে সারাজীবন শুধু 'মানুষ' নামক একটি প্রাণী হিসাবেই জীবন যাপন করে, কিন্তু 'হিন্দু' হতে গেলে তার চাই কঠোর অনুশাসনাধীন

আদর্শ যোগজীবনের সুদীর্ঘ সাধনা। ঠিক যেমন জন্মলগ্নেই কেউ ডাক্তার থাকে না, কঠোর অধ্যয়ন এবং অধ্যবসায়ের মাধ্যমেই তাঁকে ওই মহামূল্য ডিগ্রীটি লাভ করতে হয়। তাই হিন্দুত্বের দিব্যজীবন মানুষকে অর্জন করতে হয় এবং তখনই তাঁর বিশ্বজনীন-চেতনা বিকশিত হয়। ফলে হিন্দু-চেতনাই শুধু বলতে পারে—

(১) 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'

(২) 'কঙ্কর কঙ্কর মেঁ শঙ্কর হ্যায়'

(৩) 'সর্বে সুখীন ভবন্তু সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ'

(৪) 'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফূরে'

(৫) 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'

(৬) 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'

(৭) 'জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।'

(৮) 'Love all Serve all,
Help ever hurt never.'
(শ্রীসত্যসাঁইবাবা)

এই মহান আদর্শই স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, আর তাই স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তিনি বলতে পেরেছিলেন, "My Dear Sisters and Brothers of America!" বিশ্বশান্তির জন্য হিন্দুত্বের এই উদার চেতনার ব্যাপক বিস্তার যে বিশেষ প্রয়োজন সে কথা আজ বিশ্ব-বিবেকে অনুরণিত হচ্ছে। তাই দিকে দিকে শুরু হয়েছে হিন্দু জীবনারতি, উচ্চারিত হচ্ছে হিন্দুত্বের সাদর আবাহন মন্ত্র। দিকে দিকে নির্মিত হচ্ছে হিন্দুমন্দির, জলের দরে বিক্রী হয়ে যাচ্ছে চার্চ; চার্চের ফাদাররা আজ ফুটবল, বেসবল খেলার আয়োজন করে, এমনকী হুইস্কি পর্যন্তও সরবরাহ করেও ভক্ত পাচ্ছেন না, অথচ ইসকন-সহ হাজারো হিন্দু সংগঠনের আজ জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। শ্রীচৈতন্য দেবের ভবিষ্যদ্বাণী, "পৃথিবীতে যত আছে নগরাদি গ্রাম, সর্বত্র প্রচার হইবে মোর এই নাম"— কথাটি এখন আর মিথ্যা বলে মনে হচ্ছে না। ভগবান সত্যসাঁই বাবার হোরালে ভবিষ্যদ্বাণী (২০০৮ সালে)— "বিশ্বাস কর আর নাই কর আগামী ২৫ থেকে ৩০ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর সব ধর্ম এক হয়ে যাবে এবং ভারত থেকে ভক্তিধর্মের প্রবাহ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে।" এখানেও স্বামী বিবেকানন্দের সেই মহাবাণীর প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছি— "India will be the Spiritual master of the whole world"।

ধর্মনিরপেক্ষতার ফেরিওয়ালারা কি জানেন, বিখ্যাত মুসলমান সাংবাদিক মিঃ এম. জে. আকবর কি বলেছেন? বলেছেন India Secular not because of the 15% Muslum minority, but because of the Hindu Majority (Organiser 28.6.10). এদেশে রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, মুখ্যমন্ত্রী, ক্রিকেটের অধিনায়ক, এমনকী বিমান বাহিনীর প্রধানও মুসলমান হতে পারেন। এমনটা কি ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান পাকিস্তান অথবা সৌদি আরবে হতে পারে? না। কারণ 'ধর্মনিরপেক্ষতার' জন্মদাত্রীও হিন্দুত্বই। তাই বিশ্ব কল্যাণে হিন্দুত্বের সংরক্ষণ চাই সর্বাগ্রে।

*(লেখক রায়গঞ্জ কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক)*


নেত্রদান মহাদান

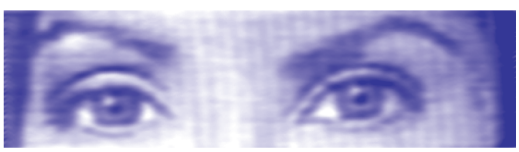

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী



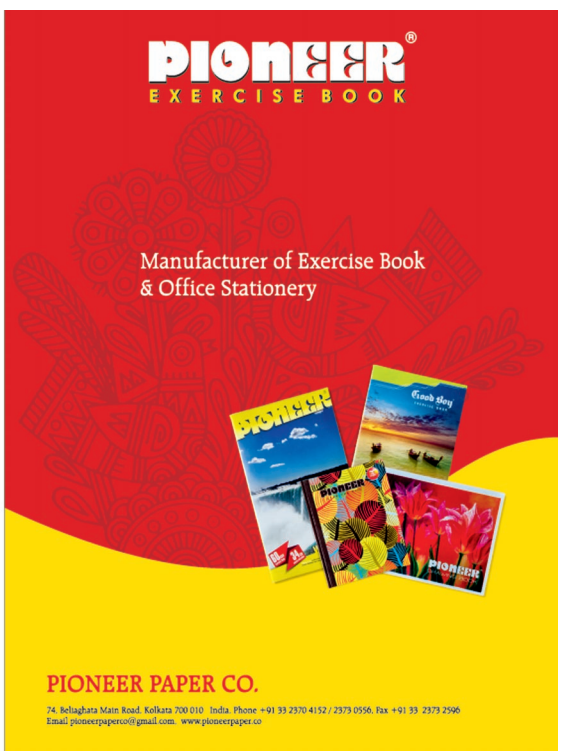

# এবারের নির্বাচনে ধর্ম ও রাজনীতি মেশেনি

**বিশেষ প্রতিনিধি॥** ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচন ফলাফল বলছে এবার দেশে একটি বড় মাপের গেরুয়া ঝড় বয়ে গেছে। এই ঝড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বহুজন সমাজ পার্টির মতো একাধিক আঞ্চলিক দল। একাধিক রাজ্য থেকে মুছে গিয়ে মাত্র ৪৪টি আসন পেয়ে কার্যত আঞ্চলিক দলে পরিণত হয়েছে শতাব্দী প্রাচীন কংগ্রেস দল। সর্বভারতীয় স্তরে কোনো দলের একক আধিপত্যের দিন শেষ হয়ে গেছে— প্রায় তিন দশক ধরে এই ধারণা জনমানসের বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। এই ধারণা মুছে গিয়ে বিজেপি ২৮২টি আসন জিতে লোকসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করল।

ভোট পড়ার পরিসংখ্যানেও এবারের নির্বাচনের ব্যতিক্রমী প্রবণতাটি উঠে এসেছে। নির্বাচন কমিশন প্রকাশিত তথ্য বলছে, সমগ্র দেশে এবার গড়ে ৬৬.৩৮ শতাংশ ভোট পড়েছে। যা কিনা স্বাধীনোত্তর ভারতের সাধারণ নির্বাচনের ইতিহাসে ১৯৮৪ সালে ৬৪ শতাংশ ভোট পড়ার সর্বোচ্চ রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়েছে। তৃণমূল স্তরের রিপোর্ট বলছে, মহিলা ও নতুন প্রজন্মের ভোটারদের মধ্যে এবার ভোট দেওয়ার যে উন্মাদনা লক্ষ্য করা গেছে তা এর আগে কখনো ঘটেনি।

একটু সন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে খোঁজ করলে দেখা যাবে, নীতিহীন রাজনীতি, দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক নেতাদের দুর্বিনীত কুৎসিত আচার-আচরণে বিশেষভাবে এই দুটি শ্রেণীর মানুষ সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত। যার প্রত্যক্ষ ফল ভোটদানে প্রবল অনীহা। কি হবে ভোট দিয়ে। যে লঙ্কায় যায় সেই রাবণ হয়। অসুস্থতা, সচেতনতার অভাব, ভোটের দিনের অনুপস্থিতি, নানা রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতার পাশাপাশি এই অনীহাও ভোটদানের হার কমে আসার একটি বড় কারণ।

প্রশ্ন হচ্ছে, মহিলা ও কমবয়সীদের মধ্যে হঠাৎ করে ভোটের প্রতি আগ্রহ জন্মাল কেন? অনেকেই বলবেন ভোটদান নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সচেতনতা কর্মসূচির প্রত্যক্ষ ফল এটি। এই অতিসরল বক্তব্য এই বলে খণ্ডন করা যাবে যে নির্বাচন কমিশন প্রতিবারের মতো এবারেও নিয়মমাফিক ভোটদান নিয়ে প্রচার ও সচেতনতা কর্মসূচী চালিয়েছে। কিন্তু এবারের কর্মসূচিতে প্রতিবারের থেকে স্বতন্ত্র এমন কিছু নেই যা থেকে ভোটারদের মধ্যে নতুন করে উদ্যম সঞ্চার হতে পারে।

এবারের নির্বাচনে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচনী ময়দানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সক্রিয় থাকার বিষয়টি অন্যান্য নির্বাচনের তুলনায় উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমী ঘটনা। সঙ্ঘ প্রথমবার দেশে রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য প্রত্যক্ষভাবে মাঠে নেমেছিল ১৯৭৫ সালে। সেসময় ইন্দিরা গান্ধীর জারি করা জরুরি অবস্থা চলাকালীন কমিউনিস্ট পার্টির মতো তথাকথিত বিপ্লবী সদস্যরা জেলের ভয়ে গা-ঢাকা দিলেও সঙ্ঘের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল এক শক্তিশালী ভূমিগত আন্দোলন। শুধু ভূমিগত আন্দোলনই নয়, সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা প্রকাশ্য সত্যাগ্রহ আন্দোলন করে দেশের সমস্ত জেল ভরিয়ে তুলেছিল। এরপর ১৯৭৭ সালে লোকসভা নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধী চরমভাবে পরাজিত হওয়ার পর স্বয়ংসেবকরা আবার তাদের স্বাভাবিক স্বভাবসিদ্ধ সামাজিক কাজে ফিরে গিয়েছিল।

সঙ্ঘ দ্বিতীয়বার অর্থাৎ এবার আগের চেয়ে অনেক বড় শক্তি ও বিভিন্ন সংগঠনকে সঙ্গে নিয়ে এবার প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচনী ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিল। একই সঙ্গে দেশে রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য যোগগুরু রামদেবের ভারত স্বাভিমান ট্রাস্ট, রবিশঙ্করের আর্ট অফ লিভিং-এর মতো একাধিক ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠন তাদের নিজ নিজ শক্তি নিয়ে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচনী ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ফলে এবারের নির্বাচনে দেশে রাজনৈতিক দলগুলির তৎপরতার পাশাপাশি বিভিন্ন অরাজনৈতিক সংগঠনের সমান্তরাল রাজনৈতিক তৎপরতা লক্ষ্য করা গেছে।

দুর্নীতিমুক্ত শক্তিশালী ভারত গড়ার লক্ষ্যে যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার জন্য প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের ভোটকেন্দ্রে যাওয়াটা আবশ্যিক কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। ১০০ শতাংশ ভোট করানো ও দেশে রাজনৈতিক পরিবর্তনের লক্ষ্য নিয়ে সচেতনতা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সঙ্ঘ ভোটের সময় দেশজুড়ে গৃহ সম্পর্ক অভিযান কর্মসূচি নিয়েছিল। সন্দেহ নেই, স্বয়ংসেবকদের প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচনী ময়দানে থাকার বিষয়টি নরেন্দ্র মোদী ও ভারতীয় জনতা পার্টি কর্মীদের সর্বাত্মক লড়াইয়ের প্রেরণা জুগিয়েছে এবং দেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে এই দলের গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়েছে। সারা দেশে ১০২টি মুসলমান অধ্যুষিত আসনে বিজেপি ও তার শরিক দলের ৫৫টি আসন জিতে নেওয়া একথার বড় প্রমাণ। নির্বাচনের আগে নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী


## যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

**স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,**

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

হিসেবে ঘোষণা করে স্বাধীনোত্তর ভারতে রাজনীতিতে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও পরিবারকেন্দ্রিকতা দেখতে অভ্যস্ত ভারতীয় জনমানস ও মিডিয়ার ব্যক্তিকে নিয়ে উন্মাদনার চাহিদা মেটানোর যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল, সেটিও আজ সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

নরেন্দ্র মোদী যোগ্য নেতৃত্ব, ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা-কর্মীদের নিরলস প্রয়াস ও অরাজনৈতিক স্তরে সঙ্ঘের জনজাগরণ কর্মসূচি আসমুদ্রহিমাচল দেশের সিংহভাগ মানুষের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতি সম্পর্কে হতাশাগ্রস্ত মানুষের মনেও নতুন করে মজবুত সরকারের মাধ্যমে শক্তিশালী ভারত গড়ার আশা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। রেকর্ড সংখ্যক ভোটারের ভোটকেন্দ্রে যাওয়া ও পরিবর্তনের পক্ষে ভোট দেওয়া একথার বড় প্রমাণ। সব মিলে বলা যায়, ভোটের ফলে নরেন্দ্র মোদী বা বিজেপি-র বিজয়বার্তা ঘোষিত হলেও ভোটের শেষে রেকর্ড সংখ্যক ভোট পড়ার পরিসংখ্যান প্রকাশিত হতেই এবারের নির্বাচনে সঙ্ঘের বিজয়-বার্তা ঘোষিত হয়েছে।

এই ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনগুলি প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচনী ময়দানে নামাতে যাদের রাজনৈতিক ক্ষতির সম্ভাবনা স্বাভাবিক ভাবেই তাঁরা ভারতের মতো ধর্মনিরপেক্ষ দেশে ধর্মের সঙ্গে রাজনীতি মেশানোর অভিযোগ তুলে এই তৎপরতার বিরুদ্ধে সরব হয়। আম জনতার মধ্য থেকেও এরকম প্রশ্ন উঠে আসতে শোনা গেছে, সঙ্ঘ আবার রাজনীতি করতে শুরু করল নাকি? আসলে সঙ্ঘের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কাজের ধরন, ভারতীয় সংস্কৃতি ও বাস্তব পরিস্থিতির যথাযথ মূল্যায়নে ঘাটতি থাকলে এধরনের প্রশ্ন উঠবে— এটাই স্বাভাবিক।

দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, ক্ষুধা, দারিদ্র, বেকারি, সংখ্যালঘু তোষণ, জাতপাতভিত্তিক ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির জেরে দেশ আজ খাদের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ যে একদিকে দুর্বল প্রতিবেশী ভারতকে চোখ রাঙাচ্ছে, অন্যদিকে দেশের নিরাপত্তাকে বারুদের স্তূপের উপর দাঁড় করিয়ে জেহাদি মুসলিমদের খুশি করতে ধর্মনিরপেক্ষতার ভেকধারি বিভিন্ন দলীয় সরকার হিন্দু সাধু-সন্তদের মিথ্যা অপবাদ দিয়ে হেনস্থা থেকে শুরু করে হিন্দুদের সন্ত্রাসবাদী সাজিয়ে জেলে ঢোকানো এমনকি সঙ্ঘের মতো দেশপ্রেমিক হিন্দু সংগঠনের গায়েও সন্ত্রাসবাদী তকমা লাগানোর প্রয়াস শুরু হয়েছিল।

এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের কল্যাণই যাদের ধ্যান-জ্ঞান, সেরকম দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী ভাবনাসম্পন্ন নাগরিক ও সংগঠনের ভোট সম্পর্কে নিস্পৃহ থাকার অর্থ চোখ বন্ধ করে প্রলয়কে অস্বীকার করা। বলার অপেক্ষা রাখে না এই পরিস্থিতিতে পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তির বলিষ্ঠ নেতৃত্বকে ক্ষমতাসীন করার জন্য ভোটারদের সচেতন করাই প্রকৃত দেশসেবা।

## ওড়িশায় চতুর্থবার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে এবারে ওড়িশা বিধানসভা নির্বাচনও হয়ে গেল। ৬৭ বছরের নবীন পট্টনায়েক এবারে চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিতে চলেছেন। ওড়িশা বিধানসভার ১৪৭টি আসনের মধ্যে তাঁর দল বিজেডি (বিজু জনতা দল) পেয়েছে ১১৭টি অর্থাৎ তিন চতুর্থাংশ আসন। তাদের প্রাপ্ত ভোটের হার ৪৩.৪ শতাংশ। ১৯৯৭-এর পর আসন ও শতাংশের নিরিখে এটাই সর্বোচ্চ। বিজেডি-র প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ৯৩ লক্ষ। অন্যদিকে কংগ্রেস সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। সংবিধানসভায় মাত্র ১৬টি আসন পেয়েছে কংগ্রেস। কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ৫৫ লক্ষ, শতাংশের হিসেবে ২৫.৭ শতাংশ। ১৯৯০ সালে কংগ্রেস যখন বিধানসভায় ১০টি আসন পেয়েছিল তখন শতাংশের হিসেবে তাদের ভোট ছিল ২৯.৭৮ শতাংশ। লোকসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কংগ্রেস ২৬ শতাংশ ভোট পেলেও এই প্রথম কংগ্রেস ওড়িশায় কোনো আসন পায়নি। গিরিধারী গোমাঙ্গ, হেমেন্দ্র বিশওয়াল, শ্রীকান্ত জানা, ভক্তচরণ দাসের মতো কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারা পরাজিত হয়েছেন।

ওড়িশা বিধানসভায় বিজেপি মাত্র ১০টি আসন পেয়েছে। শতাংশের হিসাবে ১০.৫ শতাংশ।

## অন্ধ্র ও তেলেঙ্গানা : দুই রাজ্যেই চন্দ্রোদয়

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** আগামী ২ জুন থেকে অন্ধ্রপ্রদেশ ভেঙে গঠিত হবে তেলেঙ্গানা রাজ্য ও অন্ধ্র। এখনও ভাগ না হওয়া অন্ধ্র বিধানসভায় আসন সংখ্যা ২৯৪টি। তেলেঙ্গানা অংশে রয়েছে ১১৯টি আসন। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে টি আর এস একাই দখল করেছে ৬২টি আসন। অর্থাৎ নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নিয়ে নতুন তেলেঙ্গানা রাজ্যের প্রথম সরকার গড়তে চলেছেন চন্দ্রশেখর রাও। তেলেঙ্গানা বিধানসভায় কংগ্রেসের বিধায়ক থাকছেন ২১। মুসলমান সংগঠন এম আই এম পেয়েছে ৬টি আসন। রাজ্যের উন্নতির জন্য শ্রীরাও নরেন্দ্র মোদীর সহযোগিতা চান বলে জানিয়েছেন।

অন্ধ্রে টিডিপি (তেলুগু দশম পার্টি) নেতা চন্দ্রবাবু নাইডু মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন। ১৭৫ বিধানসভা আসনের মধ্যে টিডিপি-র দখলে আসছে ১১৫টি আসন।

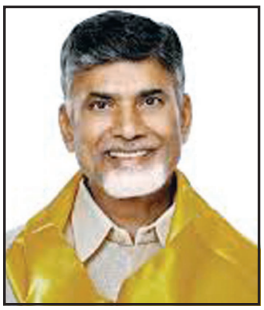

*চন্দ্রবাবু নাইডু*

*চন্দ্রশেখর রাও*

বিজেপি পেয়েছে ১২টি আসন। কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসা প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই এস আর রেড্ডির পুত্র জগমোহন রেড্ডির দলের উপরেও ভরসা রখেনি সীমান্ধ্রের মানুষ। বিপরীতে চন্দ্রবাবু নাইডুর যথেষ্ট প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা রয়েছে। চন্দ্রবাবু মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় হায়দরাবাদ হয়ে উঠেছিল সাইবারবাদ। ফলে মোদী-চন্দ্রবাবুর জুটিতে আস্থা রেখেছে অন্ধ্র। যে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে অন্ধ্রপ্রদেশকে ভাগ করল কংগ্রেস, আখেরে তার কোনো লাভই তুলতে পারল না। বরং তা লোকসভায় ও দুই রাজ্যের বিধানসভায় ভরাডুবি হলো কংগ্রেসের।

# জাগো ভারত লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ মোদী সরকার

**অমলেশ মিশ্র**

নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় ভারত সরকার গঠিত হয়েছে। আমরা আশা করতে পারি যে ব্রহ্মশক্তিযুক্ত ক্ষত্রিয় সরকার গঠিত হয়েছে। আমরা আরও আশা করতে পারি যে যুবসমাজ তথা দেশ অনুসরণ করার মতো রোল মডেল প্রধানমন্ত্রী পেয়েছে।

১৯৪৭-এ ইংরাজদের হাত থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর এই সুদীর্ঘ সময় যে সব নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়েছে সেগুলি সবই সেমেটিক প্রভাবে প্রভাবিত ইন্ডিয়ানদের নেতৃত্বে। এই প্রথম হিন্দু জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ কোনো ভারতীয় ভারতের প্রধানমন্ত্রী হলেন। এখন রাষ্ট্রভক্তি বা ভারতভক্তিকে কেন্দ্র করে দেশ পরিচালিত হবে।

ভারতবর্ষ হিন্দুজাতির দেশ। এই দেশের সরকার সেমেটিক (ইহুদি-খৃস্টান-ইসলাম) প্রভাবে প্রভাবান্বিত হওয়ার কথা নয়। এই দেশে হিন্দু দর্শনের প্রভাব থাকাই সঙ্গত ছিল। এই হিন্দু দর্শনের আদর্শ এমন একটি আদর্শ— যা বিশ্বের যে-কোনো দেশের পক্ষেই মঙ্গলদায়ক।

হিন্দু আদর্শের মূল কথা হলো—মানবিকতা এবং মানবকল্যাণই একমাত্র ধর্ম। জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণসাধন। যেহেতু হিন্দু দর্শনে মানুষ মাত্রেই অমৃতের সন্তান, সেহেতু জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায় ইত্যাদি বিচার নিরর্থক তথা অকল্যাণকর।

এতকাল প্রচলিত ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতি এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নামে সংখ্যালঘু তোষণ ভারতবর্ষে মানবিকতাকে বিপর্যস্ত করেছে। অনুদান ভিত্তিক রাজনীতি মানুষকে আত্মশক্তি ভুলিয়ে অনুদানজীবী ভিক্ষুকে পরিণত করেছে। মানুষকে ভিক্ষাজীবী করে ইন্ডিয়ানদের সরকার গর্ব বোধ করেছে।

সরকারের কাজ রোজগার করার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া। দান এবং অনুদান সমর্থ মানুষের উপার্জন-উৎস হতে পারে না। আর্থিক ভাবে দুর্বলদের জন্য সাময়িক ভাবে বিশেষ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাদের সফল হওয়ার পথকে সুগম করা যেতে পারে এবং এই কাজ জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের জন্য করা যেতে পারে।

ব্যক্তিজীবনে যেমন পাপ-পুণ্যের চিন্তা থাকে রাষ্ট্রশক্তিরও পাপ- পুণ্যের চিন্তা থাকা আবশ্যিক। সৎকর্মে পুণ্য, অসৎ কর্মে পাপ। সৎকর্মে উন্নতি, অসৎকর্মে অবনতি। একটি উচ্চমার্গের মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত এই পাপ-পুণ্য তত্ত্ব। এই মূল্যবোধ ব্যক্তি-জীবনে যেমন অপরিহার্য রাষ্ট্রশক্তির ক্ষেত্রেও অপরিহার্য।

এই প্রথম এক নেতাকে পাওয়া গেল যাঁর একটি আদর্শবোধ আছে এবং একটি দিশা আছে। মানুষকে অগ্রসর হওয়ার মতো একটি লক্ষ্য স্থির করে দিতে পারেন। কালক্রমে এই নরেন্দ্র মোদী রোল মডেল হয়ে উঠতে পারেন। সুভাষচন্দ্র বসুর পর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জগতে আর কোনো রোল মডেল পাইনি। গান্ধীজীর কথা মাথায় রেখেই এই কথা বলছি। গান্ধীজীকে কোনো অনুকরণীয় রাজনৈতিক রোল মডেল বলে মানা যায় না।

হিন্দু-মুসলমান, শরণার্থী-অনুপ্রবেশকারী প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা অন্য কোনো রাজনৈতিক নেতা যাই-ই বলুক না কেন, শরণার্থী প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড স্থিরীকৃত হয়েই আছে। এবং সেই মানদণ্ডে জান, মান ও ধর্ম রক্ষার খাতিরে অন্যদেশ থেকে পালিয়ে আসা হিন্দু মাত্রেই শরণার্থী। দেশভাগের জন্য তাঁরা দায়ী ছিলেন না, তাই হিন্দুস্থানে তাঁদের জায়গা দিতে হবে। আর অনুপ্রবেশকারীরা এদেশে আসে বে-আইনিভাবে এবং তাদের বিতাড়ন রাষ্ট্রীয় কর্তব্য। অনুপ্রবেশকারীরা এদেশের মানুষের রেশনে ও রোজগারে বে-আইনি ভাবে ভাগ বসাচ্ছে। তাদের বিতাড়নের কথা বললে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মর্মব্যথা হওয়ার কারণ নেই। একটি আইনসিদ্ধ ভারত সরকার বে-আইনি, অবৈধ বসবাসকারীদের বহিষ্কার করবে— এটাই এক ভারতীয় রাষ্ট্রনেতার কর্তব্য।

হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা ভারতবর্ষে কিছু নতুন নয়। দাঙ্গাবাজরা প্রশ্রয় ও সমবেদনা পেলে ভীষণতর হয়। দাঙ্গাবাজদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে ঢিল ছুঁড়লে পাটকেল খেতে হয়। কাউকে মারলে নিজেরও মার খাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। আর সেই পাল্টা মার খাওয়ার পর তার দগদগে ঘা দেখিয়ে করুণা ভিক্ষা কাপট্য। তা কখনও সহানুভূতি দাবি করতে পারে না।

দেশের সমগ্র দিশা যদি রাষ্ট্রভক্তি-ভিত্তিক হয় এবং বিকাশই যদি লক্ষ্য স্থির হয় তাহলে জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায় প্রসঙ্গগুলি আসেই না। হিন্দু-দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারত সরকার প্রবল উদ্যম, অদম্য মনোবল এবং কোটি কোটি মানুষের শ্রমকে মূলধন করে সব ধরনের জাতি-ধর্ম ও সম্প্রদায়ের উন্নতি ঘটাতে সক্ষম। ভারত সরকারকে দরিদ্র-অদরিদ্র মানুষের কথা ভাবতে হবে। হিন্দু বা মুসলমান ভাবনা অবান্তর। বিকাশ সকলের জন্য। হিন্দু দর্শন সেই বিকাশের কথা বলে। নরেন্দ্র মোদী যদি সেই হিন্দু দর্শনে অবিচলিত নিষ্ঠা রেখে সরকার পরিচালনা করেন এবং দেশবাসী তাঁকে যদি শক্তি যোগান, অচিরেই ভারতবর্ষ একটি উন্নত দেশ হিসাবে পরিগণিত হবে।

সরকার পরিচালকরা পাপ-পুণ্য বিচারহীন, আদর্শহীন হওয়ার কারণেই এত ভ্রষ্টাচার, এত দ্বিচারিতা, এত ধর্মবৈষম্য আমাদের সর্বনাশ করেছে। অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র থেকে গেছেন। তাঁরা যে জাতি, যে ধর্ম বা যে সম্প্রদায়েরই হোন, তাঁরা ভারতবাসী হিসাবে 'ন্যায়' পাওয়ার অধিকারী। সে অধিকার তাঁদের দিতে হবে। এবং হিন্দু দর্শনের ভিত্তিতে পরিচালিত ভারত সরকার তা দিতে সক্ষম।

নরেন্দ্র মোদী নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন ও পরিচালনার সুযোগ পাওয়ায় আমরা তা আশা করব।

তাহলেই ভারতের পক্ষে ধীর ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

# আদর্শ গ্রাম—নির্মল গ্রাম

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** মানুষ নিজের উন্নতির জন্য সব কিছু করে। যেমন সমাজের কাজের জন্য কোনো একজন আদর্শবান ব্যক্তিকে সামনে রেখে আমরা এগিয়ে চলার চেষ্টা করি, কিন্তু আমরা কখনো কি একবারও ভেবে দেখেছি কোনো গ্রাম আমাদের সামনে আদর্শ গ্রাম হিসাবে পরিচিতি পাবে যে গ্রামকে দেখে ভারতের অন্য কোনো গ্রাম এগিয়ে চলার চেষ্টা করবে?

তেমনই একটি গ্রামের সন্ধান মিলেছে উত্তরাখণ্ডের গংগোলিহাট মহকুমায় 'রণকোট'। পুরো গ্রামেই মেথর সম্প্রদায়ের বাস। গ্রামটি অন্য সব পিছিয়ে পড়া গ্রামের

*রাজেন্দ্র সিং বিস্ত-এর নেতৃত্বে গ্রামবাসীরা গ্রাম সাফাই করছেন।*

মতোই সবদিক থেকে অনুন্নত ছিল। আজ থেকে চার বছর আগে গ্রামে কোনো সরকারি আধিকারিক পর্যন্ত আসতে চাইতো না। সেই গ্রাম আজ সকলের নজর কেড়েছে। তাই এখন শুধু সরকারি আধিকারিক নয় দেশ-বিদেশ থেকে পর্যটকরাও এই গ্রামের পরিবর্তন কীভাবে হয়েছে দেখতে আসছে। এই গ্রামে যখন উন্নতি বলতে কিছুই ছিল না, কি পানীয় জল, কি শৌচালয়, কি রান্নার গ্যাস। আজ থেকে চার বছর আগে রাজেন্দ্র সিং বিস্ত নামের এক যুবক এই গ্রামের উন্নতির জন্য সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিল। গ্রামের মানুষের কাছে গিয়ে বোঝাতে থাকেন যদি আমরা কিছু সময়, কিছু পরিশ্রম করতে পারি তাহলে এই গ্রামের চেহারা বদলে যাবে। এই কথা প্রচার করে গ্রামের মানুষের কাছে বিশ্বাস অর্জন করেন। তারপর এই গ্রামে বাহাদুররাম এবং নন্দিনী দেবীর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়।

প্রথমে পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের জন্য একটি ছোট নালার সংস্কার করা হয় এবং জল সংরক্ষণের জন্য প্রাকৃতিক উপায়ে জলাধার নির্মাণ করা হয়। তারপর ধীরে ধীরে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা সকলের কাছ থেকে সংগ্রহ করে ফিল্টার ট্যাঙ্ক, জলের পাইপ ও অন্যান্য সরঞ্জাম লাগানোর কাজ গ্রামের মানুষের প্রচেষ্টায় সম্পন্ন হয়। পরবর্তীকালে যখন ঘরে ঘরে পানীয় জলের ব্যবস্থা হয় তখন গ্রামের মানুষের উন্মাদনা ও আনন্দ চোখে পড়ার মতো ছিল। গ্রামের মানুষের এই কঠোর পরিশ্রম যেন ভগীরথের গঙ্গা আনার মতো কষ্টসাধ্য ছিল।

গ্রামের মানুষের কঠোর পরিশ্রম ও উদ্যোগ দেখে সরকার এবং টাটাগোষ্ঠীর 'রতন টাটা ট্রাস্ট' সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসে। এই ট্রাস্ট গ্রামের প্রতিটি ঘরে ঘরে শৌচালয় বানানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করে। গ্রামের মানুষেরা নিজেদের পরিশ্রম দ্বারা এক মাসের মধ্যে ঘরে ঘরে শৌচালয় বানিয়ে ফেলে। অন্যদিকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই গ্রামের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির সমস্ত ছবি কেন্দ্র সরকারের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। ফল স্বরূপ ২০০৬ সালে সবদিক বিচার করে এই 'রণকোট' গ্রামকে কেন্দ্র সরকার সারা ভারতের মধ্যেও 'নির্মল গ্রাম' হিসাবে স্বীকৃতি দেয় এবং নগদ ২ লক্ষ টাকা পুরস্কার হিসাবে পায়। এই 'নির্মল গ্রাম' পুরস্কারের টাকা রাজেন্দ্র বিস্তকে গ্রামের মানুষ দেওয়ার পরিকল্পনা করেন। কেননা তিনিই এই গ্রামের রূপকার। কিন্তু তিনি পুরস্কারের টাকা না নিয়ে সেই টাকার সঙ্গে গ্রামের মানুষের থেকে আরো কিছু টাকা সংগ্রহ করে ঘরে ঘরে রান্নার গ্যাসের ব্যবস্থা করেন। এখন এই গ্রামে পানীয় জল, শৌচালয়ের পাশাপাশি প্রতিটি ঘরে ঘরে রান্নার গ্যাস পৌঁছে গেছে যেটা গ্রামের মানুষের কাছে উপরি পাওনা। সাংবাদিকদের কাছে একান্ত সাক্ষাৎকারে রাজেন্দ্র বিস্ত বলেন, ''চার বছরের পরিশ্রমের ফলে পুরো গ্রাম যেন পরিষ্কার- পরিচ্ছন্ন হয়ে ঝলমল করছে। এখন আমাদের গ্রামের ছেলে-মেয়েরা সবার থেকে সবদিক থেকে সংস্কারপূর্ণ ও শিক্ষিত এবং গ্রামের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য এখন সবাই সচেতন হয়েছে। সরকার কিছু করুক বা না করুক এখন হিমালয় থেকে গঙ্গা নেমে আসতে শুরু করেছে।'' তাই এখন রণকোট গ্রাম সারা ভারতের কাছে একটি অনবদ্য গ্রাম হিসাবে সকলের কাছে পরিচিতি লাভ করেছে।

পুস্তক প্রসঙ্গ

# সরল ভঙ্গিতে লেখা জীবনের অনুপম রূপ

**রমাপ্রসাদ দত্ত**

লেখার ক্ষেত্রে বিষয়ের গুরুত্ব বেশি না লেখার ভঙ্গি? —এ নিয়ে বিতর্ক অনেক চলেছে। কেউ কেউ গুরুত্ব দিয়েছেন বিষয়কে। কেউ ভঙ্গিকে। কোনোটাকেই অস্বীকার করা যায় না। কথাশিল্পের নিপুণ স্রষ্টারা নিজেদের কাজের প্রতি সবসময় নিষ্ঠাবান ও শ্রদ্ধাশীল। কথার পিঠে কথা সাজানোর সময় তাঁরা সবসময় ভাবেন বিষয় অনুসারী ভঙ্গিতে লেখা তৈরি হচ্ছে তো? লেখালিখির ক্ষেত্রে কোনো বিধিনিষেধের গণ্ডী কাটা নেই। লিখবার স্বাধীনতা সকলের আছে। কিন্তু কাগজ কলম হাতের সামনে থাকলেই সকলের পক্ষে লেখা সম্ভব নয়। আর একটা কোনো মানে পৌঁছাতে হলে চাই ধারাবাহিক অনুশীলন। তবে তার মধ্যে ব্যতিক্রমী ক্ষমতাধর কেউ কেউ থাকেন। যাঁদের প্রথম লেখাই পাঠকের দরবারে অন্যরকম সাড়া ফেলে। আবার কেউ কেউ আশাহত না হয়ে চালিয়ে যান চর্চা। আত্মগর্ব নয়, কঠোর আত্মসমালোচনার সঙ্গে নিবিড় অনুশীলনে শক্তি অর্জন সম্ভব। অধিকাংশ স্রষ্টা সেভাবেই এগিয়েছেন। তাঁদের মনের দৃঢ়সঙ্কল্পই এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। ‘প্রহরী’ ছদ্মনামের আড়ালে থেকে প্রবীণ লেখক অনেকগুলি উপন্যাস প্রকাশ করে ফেলেছেন। ‘নাগরেণু’ তাঁর চতুর্থ উপন্যাস। উপন্যাসের বিষয় প্রেম। ওই বিষয়টা আমাদের প্রত্যহিক জীবনের অনেকটাই জুড়ে থাকে। ‘প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে কোথা কে ধরা পড়ে কে জানে।’ এই ধরা পড়ার পর কিংবা আগে আমাদের হৃদয়ের অন্তর্গত রক্ত কীভাবে খেলা করে? চোখে দেখা যায় না। অনুভব হয়তো সম্ভব। প্রহরী ছদ্মনামের আড়ালে রয়েছেন যে লেখক তিনি সরকারি কর্মী। ছদ্মনামের আড়াল নিয়ে কর্মক্ষেত্রের অস্বস্তিকর কৈফিয়ৎ দেওয়ার দায় এড়িয়েছেন। তবে নিজের আলোকচিত্র বইয়ের মধ্যে ছেপে হয়তো বলতে চেয়েছেন : এই বইয়ে আমার নাম না থাকলেও ফোটোগ্রাফ রয়েছে। অতএব আত্মপরিচয় পুরোপুরি দিতে না




চাইলেও অনেকটা দিয়েছেন।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ভবানীপ্রসাদ পেশায় লেখক। লিখে নামও হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবন একাকিত্বে ভরা। মা কিছুদিন আগেও ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর ভবানীর জীবনে উদাসীনতা বেড়ে গেছে। বাড়িতে একজন কর্ম-সহায়ক রয়েছে। দাসু। তার ভূমিকা অনেকটা অভিভাবকের মতো। ভবানীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু নলিনী। তার মাকে ভবানী মায়ের মতোই শ্রদ্ধা করে। তাঁর কাছে ভবানী আর নলিনীর কোনো তফাত নেই। ভবানীর একাকিত্বে ভরা জীবন নিয়ে চিন্তিত নলিনী ও তার মা। এর মধ্যেই আসে ভবানীর এক পাঠিকা জয়ন্তী। যে কিছুকাল আগে হারিয়েছে বাবা-মাকে। তার বন্ধু মণিকা ও স্বামী সুজয় দুঃসময়ে জয়ন্তীর পাশে দাঁড়ায়। নলিনী আইনজীবী। জয়ন্তীর প্রাপ্য আদায় ও তার চাকরির ব্যবস্থা করে। নলিনীর মায়ের একান্ত উদ্যোগে দুটি একাকিত্ব ভরা জীবন অন্য ছন্দ পায় জীবনের চলার পথে। একেবারে অতি চেনা বিষয়কে অবলম্বন করে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে বাক্য সাজিয়ে ‘নাগরেণু’ উপন্যাসকে আকর্ষণীয় রূপ দিয়েছেন লেখক। লেখকের মুন্সিয়ানা আছে। কর্মজীবন শেষ হওয়ার পরও কি তিনি ছদ্মনাম ব্যবহার করবেন? ছদ্মনামের আড়াল নিন বা না নিন তিনি আরও লিখুন—এটাই চাইবো।

**নাগরেণু। প্রহরী। আগন্তুক প্রকাশনী। ১৪ শশীভূষণ নিয়োগী গার্ডেন লেন। কলকাতা-৩৬। দাম : ৬০ টাকা।**

**‘হাটেবাজারে পত্রিকা’। সম্পাদক : শুভেন্দু ভট্টাচার্য। প্রসাদপুর স্বামী বিবেকানন্দ সেবা নিকেতন : ডাক : কুষ্টিয়া কলকাতা-১৫০। দাম : ৩০ টাকা।** নতুন কিছু করে পাঠকদের হৃদয়ের কাছাকাছি আসার উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে এই পত্রিকা। প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় অনেক আকর্ষণীয় লেখা ছাপা হয়েছে। গল্প, কবিতা, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, রাশিফল রয়েছে। পত্রিকাটা কোনো চরিত্র পায়নি এখনও। আশা করি কয়েকটা সংখ্যার মধ্যে স্পষ্ট হবে উদ্দেশ্য ও ভাবনা।

# সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ, দক্ষিণবর্গ

প্রতিবছরের মতো এই বছরের গ্রীষ্মাবকাশে সারা দেশে ৭০টিরও বেশি স্থানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বার্ষিক সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ শুরু হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে প্রথম বর্ষের এই শিক্ষা বর্গ হাওড়া জেলার তাঁতিবেড়িয়াস্থিত সারদা শিশুমন্দির প্রাঙ্গণে ১৪ মে থেকে শুরু হয়েছে। চলবে ৩ জুন পর্যন্ত।

১৪ মে সন্ধ্যায় এক মনোরম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বর্গের উদ্বোধন হয়। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় বৌদ্ধিক প্রমুখ ভাগাইয়াজী তাঁর বিশেষ ভাষণে শক্তিশালী হিন্দু সংগঠনের জন্য স্বয়ংসেবকদের শারীরিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে বলেন— 'বন্দুকের নলের থেকেও মানুষের মন অধিক শক্তিশালী। নিরন্তর অভ্যাসের কারণে এই মনোবল বৃদ্ধি পায়। সাহস বাড়ে। দেশাত্মবোধ, অনুশাসন ও একাত্মতাই জাতিকে নির্মাণ করে।' বর্গে স্বয়ংসেবকেরা জাতিগঠনের জন্য এই শিক্ষাই পাবে।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল অশোক কুমার সেন তাঁর ভাষণে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ তরুণদের মধ্যে শারীরিক সক্ষমতা ও বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য যে camp (বর্গ)-এর আয়োজন করেছে তার জন্য তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন। শ্রীসেন আরও বলেন যে শারীরিকভাবে সক্ষম থাকতে পারলেই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব।

এই বর্গে দক্ষিণবর্গের সমস্ত জেলা থেকে প্রতিনিধিত্ব হয়েছে। সুন্দরবন জেলার (দঃ ২৪ পরগণা) ৫১ জন, দক্ষিণ মুর্শিদাবাদের ১৬ এবং বর্ধমান জেলার অন্তর্গত আসানসোলের ১৭ ও কাটোয়ার ১৫ জন-সহ মোট ২৬৯ জন স্বয়ংসেবক বর্গে অংশ নিয়েছেন—যাঁদের বয়স ৪০ বছরের কম। এর মধ্যে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠরতদের সংখ্যা ২৩, দশম শ্রেণীর পরীক্ষার্থী ৪৩, দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠরত ও পরীক্ষার্থী ৭৭, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ৩৮, শিক্ষক ১৯, চাকুরিজীবী ২০, ব্যবসায়ী ২০ এবং কৃষিজীবী রয়েছেন ৪৭।

৪০ বছরের বেশি বয়সের স্বয়ংসেবকদের নিয়ে একটি বিশেষ বর্গ একই সঙ্গে একই দিনে শুরু হয়েছে। ব্যবসায়ী, কৃষক, প্রধান শিক্ষক, অধ্যাপক, IT কর্মরত ও চাকুরিজীবীদের মিলিত সংখ্যা ২৯। প্রবন্ধক ও শিক্ষকের সংখ্যা ৬০।

# সংস্কার ভারতীর আঞ্চলিক শিল্পী সম্মেলন

শরৎ স্মৃতি সদনে সংস্কার ভারতীর পাঁচটি শাখার মিলিত আঞ্চলিক শিল্পী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উত্তর কলকাতা, দক্ষিণ কলকাতা, বেহালা, বাগুইহাটি ও সম্মেলন সোনারপুর শাখা। শাখাগুলি গীতি আলেখ্য, লোকগীতি বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করে। দক্ষিণ কলকাতা শাখার সম্পর্কিত স্থান আনন্দপুরের বেশকিছু ছোটো ছোটো শিশু কিশোরদের নিয়ে প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক লীলা মজুমদারের লঙ্কা দহন পালা নাটক উপস্থাপন করে। নাটকটি খুবই প্রশংসাযোগ্য হয়।

আমাদের শাখার বার্ষিক সাধারণসভা অনুষ্ঠিত হয় গত ১৮ এপ্রিল। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় নাট্য সম্পাদক বিকাশ ভট্টাচার্য, প্রদেশ সম্পাদিকা নীলাঞ্জনা রায়। বাগুইআটি শাখার উপদেষ্টামণ্ডলীর সাহায্য সুকুমার সেন সাংগঠনিক বক্তব্য রাখেন। শাখার সম্পাদক প্রদ্যোত মুকুটমণি গত বছরের শাখার কাজকর্ম বিষয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেছিলেন শাখার সংগঠন সম্পাদিকা মীরা দাস।

# সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ, রায়গঞ্জ

**বাসুদেব পাল।।** গত ১৪ মে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্ব ক্ষেত্রের 'দ্বিতীয় বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ' এবং উত্তরবঙ্গের 'প্রথম বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ' (গ্রীষ্মকালীন প্রশিক্ষণ বর্গ) উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জস্থিত সারদা বিদ্যামন্দির বিদ্যালয়ে শুরু হয়েছে। প্রদীপ প্রজ্বলন করে বর্গের উদ্বোধন করেন পূর্বক্ষেত্রের সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশেষ অতিথি এবং রায়গঞ্জ শহরের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তার ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক বিদ্রোহী সরকার, দ্বিতীয়বর্ষের সর্বাধিকারী সুধীর মিশ্র, প্রথম বর্গের বর্গাধিকারী শুকদেব ভগত। ক্ষেত্র কার্যবাহ সত্যনারায়ণ মজুমদার বর্গের বিভিন্ন অধিকারীর নাম ঘোষণা করেন। দ্বিতীয় বর্ষের মুখ্যশিক্ষক উত্তম রায় (উঃ বঃ প্রান্ত শারীরিক প্রমুখ), কার্যবাহ হৃষীকেশ সাহা (দিনাজপুর বিভাগ কার্যবাহ)। প্রথম বর্ষের মুখ্যশিক্ষক সনাতন শীল (পশ্চিম কুচবিহার জেলা প্রচারক)। দ্বিতীয় বর্ষের সর্বাধিকারী ওড়িশার ঢেঙ্কানল বিভাগ সঙ্ঘচালক এবং প্রথমবর্ষের বর্গাধিকারী উত্তর মুর্শিদাবাদ জেলা সঙ্ঘচালক। দ্বিতীয় বর্ষের সহ-মুখ্যশিক্ষক ওড়িশা থেকে আগত বিভাগ প্রচারক রমাকান্ত মহন্ত। অনুষ্ঠানে উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ প্রদীপ অধিকারী, প্রান্তপ্রচারক গোবিন্দ ঘোষ, ক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত, উৎকল প্রান্ত প্রচারক জগদীশ খাড়ঙ্গা-সহ অনেক বিশিষ্ট কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৩০ এবং প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী স্বয়ংসেবকদের সংখ্যা ৯৩ জন।

বিশেষ অতিথির ভাষণে ডাক্তার মজুমদার বলেন, ভারতবর্ষ এক সুপ্রাচীন রাষ্ট্র এবং হিন্দুরাষ্ট্র। অতীতে বিদেশী মুসলমান আক্রমণকারীরা ভারত আক্রমণ করে ব্যাপকহারে ধনসম্পদ লুট করে নিয়েছে। এদেশ থেকে আলাদা পাকিস্তান তৈরি হয়েছে। ইংরেজরাও ভারতকে পরাধীন করে রেখেছিল। এই হিন্দুরাষ্ট্রকে সংরক্ষণ ও সংবর্ধন করার দায়িত্ব এদেশের যুবসমাজ তথা স্বয়ংসেবকদের। অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ কার্যকর্তা তৈরি ও কার্যকর্তাদের গুণমান বাড়ানোর প্রশিক্ষণ। দেশ, সমাজ ও সময়ের প্রয়োজনে সারাদেশেই সঙ্ঘকার্যকে সত্বর দ্বিগুণ বৃদ্ধি করতে হবে। এজন্য সকল শিক্ষার্থীকে কুশলী হতে হবে এবং সময় দিতে হবে। ছাত্ররা পড়াশোনা শেষ করে কয়েকবছর সময় দিয়ে নিজেদের জীবন সার্থক করুন। আগামী দিনে এদেশের সবকিছুর নিয়ন্তা হবে সংগঠিত হিন্দু সমাজ। তার প্রমাণ রামসেতু রক্ষা আন্দোলন ও অমরনাথ জমি ফেরত আন্দোলন। বিগত ৮৮ বছর যাবৎ সঙ্ঘ একাজ করে চলেছে। বর্গ থেকে ফিরে সবাই স্থানীয় কাজ বৃদ্ধিতে সংযুক্ত হোন।''

# মালদায় ঝড়ে পীড়িতদের সেবাভারতীর সাহায্য

গত ৭ মে মালদা জেলার হবিপুর ব্লকের মঙ্গলপুরা অঞ্চলের ৭টি গ্রামের ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির হাতে অনুদান তুলে দিল উত্তরবঙ্গ সেবা ভারতী। গত ২৭ এপ্রিল হবিপুর ব্লকের ভূয়াডাঙ্গা, শিশুডাঙ্গা, কদমতলী, সহরাঘুটু, নকইল, মুণ্ডাপাড়া ও প্রেমডাঙ্গা গ্রামগুলিতে প্রচণ্ড ঝড়ে ঘরবাড়ি ও গাছ ভেঙে পড়ে এবং পরিবারগুলি গৃহহীন ও অসহায় হয়ে যায়। এই দিন ৭টি গ্রামের ৬৩ জনকে দুই হাজার টাকা করে এককালীন অনুদান দেওয়া হয় উত্তরবঙ্গ সেবা ভারতীয় পক্ষ থেকে। উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা সেবা প্রমুখ ভূপেশ বর্মণ। এছাড়াও গণেশ সরকার, সরকার হেমরম, উত্তরবঙ্গ সহ-প্রান্ত কার্যবাহ তরুণ কুমার পণ্ডিত ও বিভাগ প্রচারক নরেন্দ্রনাথ বেরা উপস্থিত ছিলেন।

## পরলোকে পশুপতি ঘোষ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হুগলী জেলার শ্রীরামপুর শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক পশুপতি ঘোষ গত ১৬ মে রাত সাড়ে

এগারোটা নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৭৫ বৎসর। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন। পরিবারে দাদা-বৌদি, ভ্রাতৃবধূ, ভাইপো-ভাইঝি এবং বহু গুণমুগ্ধ স্বয়ংসেবক বন্ধুদের তিনি রেখে গেছেন।

হুগলী জেলায় সঙ্ঘের কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনে তিনি অন্যতম স্থাপতি। সঙ্ঘের বঙ্গপ্রান্তের প্রান্ত প্রচারক স্বর্গীয় বসন্তরাও ভট্ট'র হাত ধরে তাঁর সঙ্ঘে প্রবেশ। ১৯৬২ সালে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা পূজনীয় ডাক্তারজীর স্মৃতি মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে হুগলী জেলার প্রমুখ হিসেবে তিনি নাগপুরে গিয়েছিলেন। একজন সাধারণ স্বয়ংসেবক কেবল আন্তরিকতাকে হাতিয়ার করে সঙ্ঘের কাজের কিভাবে বিস্তার ঘটাতে পারেন, বহুজনের প্রেরণার স্থল হতে পারেন, তিনি তাঁর উদাহরণ। তিনি অবিবাহিত ছিলেন, শেষ বয়সে জেলার স্বয়ংসেবকরাই তাঁর দেখাশোনার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। হুগলী জেলার সঙ্ঘের কাজের ইতিহাসে ঁরামপ্রসাদ দাস, ঁবংশীলাল সোনী, ঁঅনন্তলাল সোনী, রাধাগোবিন্দ পোদ্দার প্রমুখ প্রচারকের পাশাপাশি তাঁর মতো গৃহী কার্যকর্তার নামও স্মরণীয় হয়ে থাকবে। স্বয়ংসেবকদের তপস্যাজনিত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শুভ পরিবর্তনের সূচনা তিনি জেনে যেতে পেরেছেন এটাই সান্ত্বনা। তাঁর আত্মা শান্তি লাভ করুক—ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা।

## বাবা বুড়োরাজের মহামেলা

চিরাচরিত ঐতিহ্য ও উৎসবের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হলো বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী ২নং ব্লকের জামালপুরের বাবা বুড়োরাজের মহামেলা। মেলা শুরু হয়েছিল গত ২৪ বৈশাখ (৮ মে) সাত কামানের সন্ন্যাসী পূজার মধ্য দিয়ে।

মূল মেলাটি হয় হয় ৩০ বৈশাখ (১৪ মে) বুদ্ধপূর্ণিমার দিন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে হাজার হাজার ভক্ত এই মেলায় আসেন। ভক্তবৃন্দ সারারাত ধরে বাবার মাথায় জল ঢালেন। বাবার সন্ন্যাসী ভক্তদের উত্তরীয় খোলার মধ্য দিয়ে মেলার সমাপ্তি হয়।

## 'ব্লাড ফর ইন্ডিয়া'র শুভারম্ভ

গত ২ মে গুজরাটের আমেদাবাদে 'ব্লাড ফর ইন্ডিয়া'র শুভারম্ভ হলো। এটি ইন্ডিয়া হেলথ্‌লাইন-এর একটি শাখা। সংস্থার প্রধান

প্রবীণভাই তোগাড়িয়া বলেন, রক্তদানে ইচ্ছুক যে কেউ এখানে নাম নথিভুক্ত করতে পারেন ও প্রয়োজনে যে কেউ এখান থেকে রক্ত পেতে পারেন।

উল্লেখ্য, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক সংরক্ষক প্রবীণভাই তোগাড়িয়া এরকম বহু সেবা প্রকল্প আরম্ভ করেছেন। তিনি জানান দেশের সমস্ত রাজ্যে 'ব্লাড ফর ইন্ডিয়া'র শাখা শুরু করা হবে।

## শোকসংবাদ

গত ১২ মে হাওড়া জেলার চেঙ্গাইল শাখার স্বয়ংসেবক মনোরঞ্জন অধিকারী পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তিনি ১ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনি রেখে গেছেন।


KIND ATTENTION TO HOUSE OWNERS

"WATER SEAPAGE IS A DISEASE LIKE A CANCER
OF YOUR DREAM HOME. REMOVE IT AND SAFE YOUR HOME"

OUR SERVICES :

** Heat & Waterproof Solution for your Heated Roof.
** Waterproof Treatment of Roof, roof Garden Water Tank, Lift Pit, Water Body Etc.
** Leakage, Dampness & Salt Petre Treatment.
** Anti-Termite & Pest Control Treatment

CONTACT :

Calcutta Waterproofing Company
'Park Plaza'
71, Park Street, Room No. 11/12, Kolkata-700 016
98311 85740/9831272657–
emil : roy4258@yahoo.com
web : www.calcuttawaterproofing.com

# সমকালের এক রাজনৈতিক ভাষ্য
# সংস্তবের স্পর্ধাবর্ণ

**বিকাশ ভট্টাচার্য**

সংস্তবের 'স্পর্ধাবর্ণ' নাটকটি যখন বাংলার রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ হচ্ছে তখন রাজ্যের অধিকাংশ মানুষের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করে দেওয়ার প্রায় সমস্তরকম অস্ত্র রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। পুলিশী নির্যাতন, মস্তানি দাওয়াই, জঙ্গি অপবাদ এমন নিত্যনতুন ফরমানে বাংলার জনগণের দমবন্ধ করা পরিস্থিতির একঝলক দেখতে পেলাম নাট্যকার চন্দন সেন ও অভিনেতা-নির্দেশক দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক অনবদ্য যুগলবন্দী 'স্পর্ধাবর্ণ' নাটকে। স্যামুয়েল বেকেটের ভাবশিষ্য ভাচলভ বাভেলের অতি পরিচিত 'গার্ডেন পার্টি' নাটকের বিষয় ছিল আক্রান্ত গণতন্ত্রকে যে ভাবেই হোক রক্ষা করা। মূল চরিত্রও ছিল দুটি। এখানে নাটকটির বাংলা রূপান্তরের সময় অত্যন্ত সচেতন ভাবে বাংলার বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং পরিবর্তনের নামে প্রশাসনকে একরকম দলের আজ্ঞাবহ করে তোলার নির্লজ্জ প্রয়াসকে নাট্যকার তাঁর স্বাভাবিক দক্ষতায় আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। নাটকটি দেখতে দেখতে আমাদের কখনও মনে হয়নি আমরা বিদেশী কোনও নাটকের বঙ্গীয় সংস্করণ দেখছি। বরঞ্চ মনে পড়ে যাচ্ছে আমাদের চারিপাশে ঘটে যাওয়া শাসকশ্রেণীর উন্মত্ত দাপাদাপি ও প্রশাসনিক প্রধানের শরীরিভাষা ও অশালীন মন্তব্য।

সংস্তবের প্রাণপুরুষ দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায় এ যাবৎ আমাদের উপহার দিয়েছেন বহু মূল্যবোধ জাগানো নাটক, উপহার দিয়েছেন মানবিক সচেতনতা বা মানবিক সম্পর্কের নাটক। নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের বহু নাটক মঞ্চ-সফল হয়েছে তাঁর অনবদ্য সৃজনশীলতায়। 'স্পর্ধাবর্ণ' সেদিক থেকে অবশ্যই এক ব্যতিক্রম। নির্দেশক দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায় যেন বদলে যাওয়া সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের সাম্প্রতিক সময়কালের রাজনৈতিক ভাষ্য নির্মাণ করেছেন। এই নাটকে নাট্যকার চন্দন সেন রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অনেক প্রশ্নের জবাব রেখেছেন। অমোঘ সংলাপের উপযুক্ত মঞ্চ-চিত্রণের মাধ্যমে পরিচালক দর্শকমণ্ডলীকে সচেতন করেছেন— পথনির্দেশের প্রয়াস পেয়েছেন। সাম্প্রতিক চটুল, দর্শক মনোহারী, গিমিকসর্বস্ব নাটকের মাঝে এমন একটি নাটক দেখে মন ভরে যায়— বাংলা নাটকের ওপর নতুন করে আস্থা জন্মায়।

নাটকে মূল চরিত্র দুটি— নয়ন ও স্বদেশ। নাটকে দেখি একদিকে রাজ্যের শাসকশ্রেণীর মদতপুষ্ট ঠাঙাড়ে বাহিনীর অত্যাচারে প্রায় প্রতিদিন লাঞ্ছিতা হচ্ছেন, ধর্ষিতা হচ্ছেন আমাদের মা-বোনেরা। নারী নির্যাতন চরমে পৌঁছেছে। অন্যদিকে সাম্প্রতিক নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদী মঞ্চে গানে গানে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে পুলিশের হাতে বন্দী হয় তরুণ সাংস্কৃতিক কর্মী অংশুমান। পুলিশ প্রশাসনের হাতে বন্দী অংশুমানের মুক্তির দাবিতে গণস্বাক্ষর পত্রে স্বদেশের সই সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আগত নয়নের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয় স্বদেশ, কারণ নয়ন আসলে প্রশাসনেরই তল্পিবাহক। এ ভাবেই স্বদেশ ফিরিয়ে দেয় স্থানীয় পুরমাতার প্রচ্ছন্ন হুমকিতে ভরা প্রস্তাব। অংশুমানকে মুচলেকায় সই করতে হবে। তবেই পাবে মুক্তি। নয়ন আর পুরমাতার প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে আর একবার প্রকাশ্যে চলে আসে শাসকদল আর উগ্রসন্ত্রাসবাদীদের যোগসাজসের প্রশ্নটি। ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্বদেশ চেষ্টা করেছিল উপরমহলে চেনাজানা কাউকে ধরে অংশুমানকে ছাড়াতে। কিন্তু অংশুমানের সঙ্গে তার কন্যার ভবিষ্যৎ জড়িত আর অংশুমানও চায় না এভাবে ছাড়া পেতে, তাই স্বদেশ আর চেষ্টা করে না। বরং স্বদেশই বলতে পারে ওতো চুরি-ডাকাতি করে বা নারী ধর্ষণের অপরাধে জেলে যায়নি বরং অংশুমানের সন্তান যখন জানতে চাইবে বাবা কেন জেলে তখন যেন গর্ব করে বলতে পারি তোমার বাবা প্রতিবাদের গান গেয়েছিল। তাই শাসকশ্রেণীর রোষে কারারুদ্ধ। এভাবেই প্রকাশ হয় বর্তমান সময়ের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের এক কদর্য চিত্র।

অভিনয়ে প্রথমেই নাম করতে হয় স্বদেশের ভূমিকায় দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এমন মননশীল অভিনয় একমাত্র দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেই আশা করা যায়। নয়নের ভূমিকায় পার্থসারথি সেনগুপ্ত অনবদ্য। শাসকশ্রেণীর মদতপুষ্ট ভল্টাই চরিত্রে রাজু মণ্ডল সমাজবিরোধীদের উলঙ্গ চেহারাটা ভালোই ফুটিয়েছেন। পুরমাতার চরিত্রে সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল মুখোপাধ্যায় যথাযথ। সৌমিক- পিয়ালির মঞ্চ, বাদল দাসের আলো, গৌতম ঘোষের আবহ 'স্পর্ধাবর্ণ'কে এক সার্বিক সফলতা দিয়েছে। পরিশেষে আরও একবার নাট্যকার চন্দন সেন ও নির্দেশক দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানাই অকুণ্ঠ সাধুবাদ।

**শব্দরূপ-৭০৯** ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

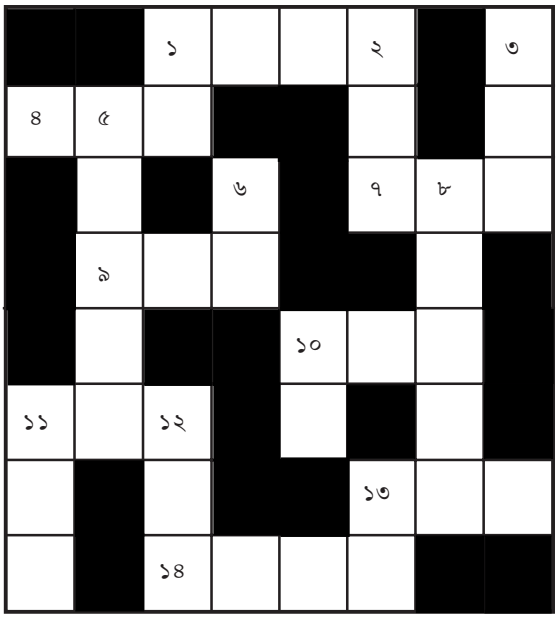


**সূত্র :**

**পাশাপাশি : ১.** চিঁড়া দই দুধ মিষ্টান্ন ফল ইত্যাদি আহার, অথবা ভাত ছাড়া অন্য নিরামিষ দ্রব্য আহার, **৪.** ভাতের কাঙাল; হতভাগা, **৭.** দশমহাবিদ্যার এক, রাজরাজেশ্বরী, **৯.** নাস্তিক মুনিবিশেষ; আত্মা, পরলোক ইত্যাদি যে মানে না, জড়বাদী, **১০.** বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার, **১১.** ব্যবহারজীবী; আইনব্যবসায়ী, **১৩.** সাধুসন্ন্যাসীর বাসস্থান, তপোবন, **১৪.** অম্ল ফলবিশেষ।

**উপর-নীচ : ১.** জয়, সিদ্ধি ('কেল্লা—'), **২.** রঙ্গকুশল, **৩.** ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লিখিত সত্যকাম-জননী, **৫.** ভাটব্রাহ্মণের মতো চাতুরী, **৬.** '—হূন দল পাঠান মোগল এক দেহে হলো লীন', **৮.** বেদান্তবিরোধী প্রাচীন ভারতের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, শঙ্করাচার্যের সঙ্গে তর্কে পরাজিত, **১০.** সুন্দরী; নারী, **১১.** বিরাটরাজকন্যা, অভিমন্যুপত্নী, **১২.** এক প্রকার বাগ্‌ভঙ্গী, **১৩.** মাতামহী, দিদিমা।

**সমাধান**
**শব্দরূপ-৭০৬**
**সঠিক উত্তরদাতা**
**শৌনক রায়চৌধুরী**
**কলকাতা-৯**
**সুমন মাহাতো**
**বালিগারা, পুরুলিয়া**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| উ | ■ | ■ | ব্য | তী | পা | ত | ■ |
| র | ■ | ■ | স | ■ | ব | ■ | ■ |
| গ | জা | ন | ন | ■ | ক | প | র্দ |
| ■ | হা | ■ | ■ | ■ | ■ | ঞ্চ | ■ |
| ■ | ন্ন | ■ | ■ | ■ | ■ | ত | ■ |
| চি | ম | নি | ■ | জ | ল | পা | নি |
| ■ | ■ | বা | ■ | য় | ■ | ■ | স্বা |
| ■ | বৈ | জ | য় | ন্ত | ■ | ■ | র্ক |

*শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।*
*খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।*

 ৭০৯ সংখ্যার সমাধান আগামী ১৬ জুন, ২০১৪ সংখ্যায়

## লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

# ।। চিত্রকথা ।। বিক্রমাদিত্য ।। ২৭

# বিশ্বের সবচেয়ে দূষণযুক্ত শহর দিল্লী

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-র সমীক্ষা অনুযায়ী দিল্লী পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি দূষণযুক্ত শহর। ৯১টি দেশের ১৬০০ শহরে করা এক সমীক্ষায় এই তথ্য সামনে এসেছে। 'এম্বিয়েন্ট এয়ার পল্যুশন' নামের সংস্থার ২০১৪-র সমীক্ষার ৯১টি দেশের ১৬০০ শহরের বায়ু পরীক্ষার এই তথ্য 'হু'র হাতে এসেছে। কয়েকমাস আগে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তাদের এক সমীক্ষার পর জানায় ২০১২-তে দূষণের ফলে পৃথিবীর প্রায় ৭০ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়। 'হু' আরো জানায়— বায়ু দূষণের ফলে হৃদয়রোগ, শ্বাস- সংক্রান্ত রোগ এবং ক্যান্সারের মতো মারাত্মক রোগের শিকার হচ্ছে পৃথিবীর মানুষ। 'হু'-র এই রিপোর্ট দিল্লীবাসীর পক্ষে চিন্তার বিষয়। কেননা এই রিপোর্ট অনুসারে ভারতের রাজধানীতে বায়ু দূষণের মাত্রা ২.৫ মাইক্রোনস্-এর কম ২.৫ ঘনত্বের সমান। এটা খুবই ভয়ঙ্কর অবস্থা। 'সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট' (সি এস ই)-এর অধিকর্তা অনুমিতা রায়চৌধুরীর মতে 'হু'-র এই তথ্য ভারতের বেহাল স্বাস্থ্য-ব্যবস্থাকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করছে।। বায়ুদূষণের কারণে রোগব্যাধিতে মৃত্যুর হারে ভারত বিশ্বের মধ্যে অন্যতম। দূষণকণা শ্বাসের মাধ্যমে আমাদের ফুসফুসে প্রবেশ করে হাঁপানি, হৃদয়রোগ ও ক্যান্সারের মতো মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে বেশির ভাগ শহরে বায়ুদূষণের মাত্রা আগের বছরের তুলনায় অনেক বেশি। এর কারণ কয়লাচালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, ব্যক্তিগত মোটরগাড়ি বৃদ্ধি ও বাড়িতে বাড়িতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের আধিক্য। দিল্লীতে ভয়ানক দূষণ বৃদ্ধির কারণ হলো অতি দ্রুতমাত্রায় ব্যক্তিগত গাড়ির ব্যবহার। সবচেয়ে ভয়ের ব্যাপার পৃথিবীর ২০টি শহরের মধ্যে ১৩টি দূষিত শহরই ভারতে।

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
26 May - 2014


# FOR INTERIORS THAT EVOKE ADMIRATION

For over two decades, Centuryply has been effortlessly redefining interiors into designer spaces with the most stunning range of products that reflect the very best of style, innovation and functionality.

**CENTURYPLY**
Quality that's a class apart!
Fortifying interiors with innovations like the first flexible ply, a 7 year termite-proof, pay back guarantee and many more…

**CENTURYVENEERS**
Exotic designs in wood!
Beautifying Interiors with an exclusive and wide range of Decorative veneers (only BWR available in India) & Senzura Styles, handpicked from around the world...

**CENTURYLAMINATES**
Style that stands out!
Trendsetting interiors with the widest range of laminates having myriad textures, stunning patterns and exquisite designs…

Also available:
**CENTURYMDF**
**CENTURYPRELAM**

CENTURYPLY®


দাম : ১০.০০ টাকা